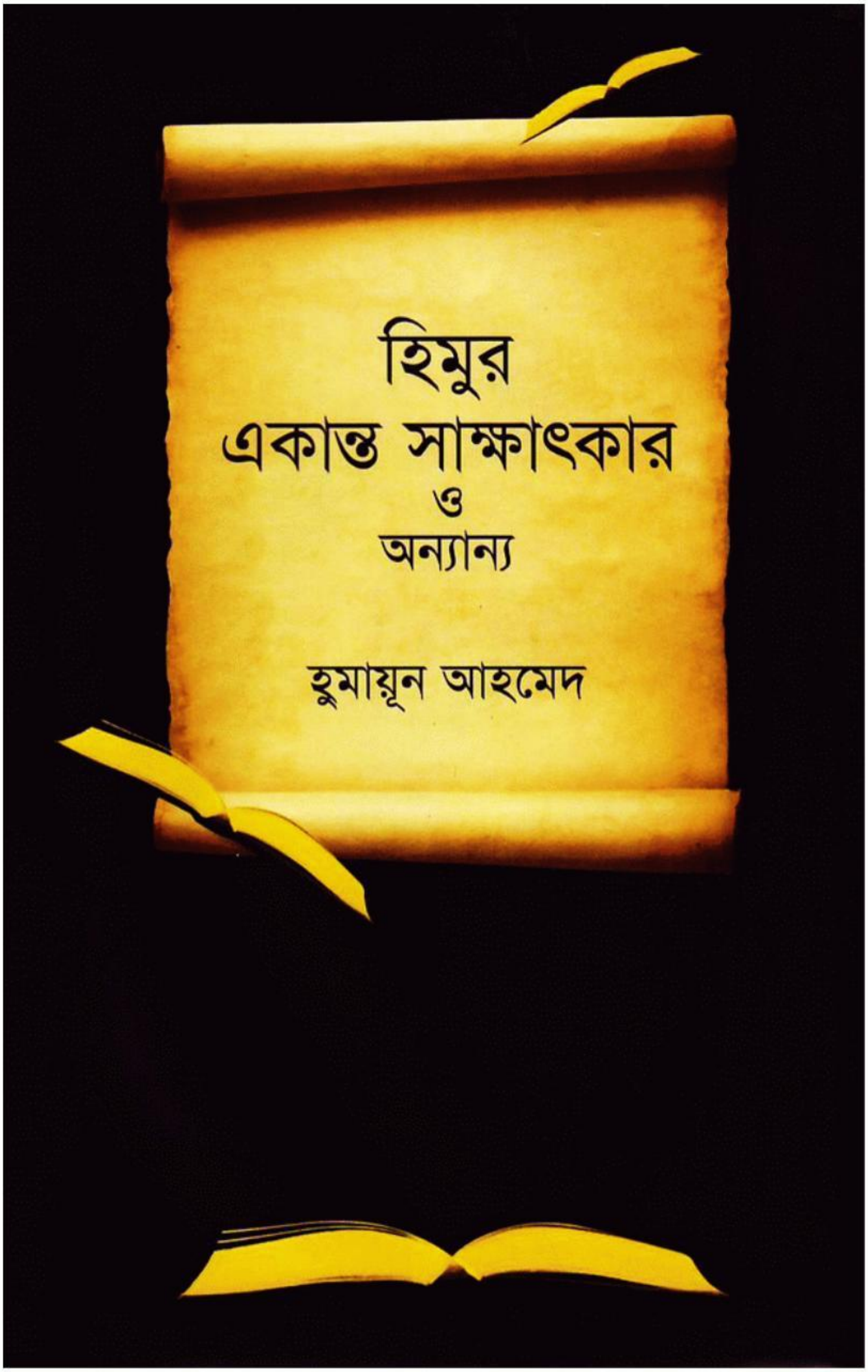

হিমুর
একান্ত সাক্ষাৎকার
ও
অন্যান্য

হুমায়ূন আহমেদ

বই বিষয়ে চৈনিকদের একটি প্রবচন হচ্ছে– বই হল একটা বাগান যা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়। গল্প সংকলনের জন্য এই প্রবচন খুব সত্যি। বাগানে নানান ধরনের ফুল, সৌরভ আছে বর্ণ নেই। বর্ণ আছে গন্ধ নেই। গল্প সংকলনেওতো এই ব্যাপারই।

প্রতিটি গল্প শুরুর আগে গল্প বিষয়ে কিছু কথাবার্তা বললাম। গল্পটি কেন লিখেছি, কিভাবে লিখেছি এই সব হাবিজাবি। যে সমস্ত পাঠক হাবিজাবি পছন্দ করেন না তারা মূল গল্পে চলে গেলে ভাল হয়।

সংকলনটির নাম আমার দেয়া না। প্রকাশকের দেয়া। তার ধারণা হিমু নামটা কোন না কোন ভাবে থাকা মানেই বেশি বিক্রি। আমি তরুণ প্রকাশকের ভুল ভাঙ্গাইনি।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর।

সূচি

নসিমন বিবি ০৯
পাপ ১৭

পাপ-২

হাজি মান্না মিয়া ২৪

পাপ-৩

সালাম সাহেবের পাপ ২৯
দৌলত শাহ্'র অদ্ভুত কাহিনী ৩৫
শাহ্ মকবুল ৫৩
পিশাচ ৬৫
গন্ধ ৭২
জনৈক আব্দুল মজিদ ৮২
হিমুর একান্ত সাক্ষাৎকার ৮৭

নসিমন বিবি

গায়ক এস আই টুটুল শুধু যে চমৎকার গান করে তা না, সুন্দর করে গল্পও বলতে পারে। তার গল্প বলার স্টাইলে মুগ্ধ হয়ে আমি প্রায়ই নাটকে অভিনয় করতে ডাকি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ক্যামেরার সামনে সে মোটেই স্বচ্ছন্দ না। ডায়ালগও মনে রাখতে পারে না। যাই হোক কি এক নাটকে মনে হয় 'চন্দ্র কারিগর' সে অভিনয় করতে এসেছে। স্যুটিং এর শেষে গল্পগুজব হচ্ছে। টুটুল শুরু করল ভূতের গল্প। নসিমন বিবি হল সেই গল্প। টুটুলের দাবি নসিমন বিবিকে সে দেখেছে। এবং নসিমন বিবির সংগ্রহের স্বর্ণ বড়ুই পাতাও দেখেছে।

আদিভৌতিক ব্যাপারে টুটুলের খুব উৎসাহ। একবার আমার ধানমন্ডির বাড়িতে সে দুই সাধককে নিয়ে এল। তাদের জ্বীনের সাধনা। ভরপেট গরুর মাংস খেয়ে এরা জ্বীনকে আহ্বান করে। জ্বীন এসে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান হড় হড় করে বলে দেয়। গরুর মাংসের সঙ্গে জ্বীনের কি সম্পর্ক কে জানে। আমি এই দুই সাধককে গরুর মাংস খেয়ে জ্বীন নামাতে বললাম।

পাঠক নিশ্চয়ই ফলাফল জানতে আগ্রহী। ফলাফল হচ্ছে আমি টুটুলকে বললাম তুমি এই দুই মহান সাধককে কানে ধরে উঠ বোস করাও। টুটুল এই কাজ দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছিল।

গল্পের নাম দেখে পাঠক বিভ্রান্ত হবেন না। এই নামের সঙ্গে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া (রিয়াজের হাস্যকর অভিনয় সমৃদ্ধ) ছবি নসিমনের কোনো যোগ নেই। নসিমন আমার নোটবুকে লেখা একটা নাম।

একসময় পশ্চিমা লেখকদের মতো আমি একটা মোটা নোট বই সঙ্গে রাখতাম। বিস্ময়কর কিছু দেখলে লিখে ফেলতাম। ডায়েরি ধরনের লেখা না, শর্টহ্যান্ড জাতীয় লেখা। উদাহরণ দেই। নসিমন বিবি'র ব্যাপারটা এইভাবে লেখা—

নসিমন বিবি
বয়স : প্রায় সত্তর
পেশা : ধাত্রী।
বিষয় : বড়ুইপাতা।
ঠিকানা : ...

আমার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিল (কেমিস্ট্রির ছাত্রদের ভালো স্মৃতিশক্তি বাধ্যতামূলক)। নোটবুকে টুকে রাখা শর্টহ্যান্ড জাতীয় লেখা পড়ে পুরো বিষয় মনে পড়বে এমন ভরসা বরাবরই ছিল। ইদানীং মনে পড়ছে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি exponentially নেমে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা। নোটবুকে টুকে রাখা অনেক লেখা পড়ে আগামাথা কিছুই পারছি না। এক জায়গায় লেখা—

কলাগাছ
বেঁটে। কলা হয় না।
বিষয় : কাঠঠোকরা পাখি (দুইটি)

অনেক চিন্তা করলাম— এর মানে কী ? কাঠঠোকরা পাখি কি কলাগাছের মতো নরম গাছে বাসা বেঁধেছে ? কিছুই মনে পড়ল না।

আরেক জায়গায় লেখা—

পদ্মদিঘি
Crystal clear water.
বিষয় : লাল রঙ

এর মানে কী ? এমন কোনো পদ্মদিঘি কি দেখেছি যার রঙ লাল ? লাল রঙের দিঘি এমন কোনো বিস্ময়কর বিষয় না। লাল রঙের শৈবাল পানিকে লাল করে দেয়। নুহাশ পল্লী'র দিঘিও মাঝে মাঝে লাল হয়। তাছাড়া শুরুতেই লেখা Crystal clear water— স্ফটিক স্বচ্ছ জল। সেই জল লাল হতে পারে না। তাহলে ঘটনাটা কী ?

একসময় জানতাম। এখন জানি না। স্মৃতির উপর এত ভরসা করা ভুল হয়েছে। খুঁটিনাটি সব লিখে রাখা দরকার ছিল।

পশ্চিমা লেখকদের আদলে নিজেকে গোছানোর একটা শখ আমার বরাবরই ছিল। তাঁরা লেখার খাতিরে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতেন। অভিজ্ঞতার স্যুটকেস সঙ্গে রাখতেন। অভিজ্ঞতা দিয়ে স্যুটকেস ভর্তি করতেন। কাজেই আমি ১৪

সিটের বিশাল এক মাইক্রোবাস কিনে ফেললাম। এই বাস নিয়ে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এমন কম জায়গা আছে, যেখানে আমি যাই নি।

হয়তো খবর পাওয়া গেল, ফরিদপুরের অমুক গ্রামে এক পীর সাহেব আছেন, যার গা থেকে অসময়ের ফুলের গন্ধ বের হয়, যিনি ভয়ঙ্কর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন। গাড়িভর্তি লোকজন নিয়ে চলে গেলাম পীর সাহেবের গায়ের গন্ধ শুঁকতে। পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নোটবুকে লিখলাম—

গন্ধপীর
বয়স : পঞ্চাশ।
বিষয় : গায়ে অসময়ের ফুলের গন্ধ।
মন্তব্য : বোগাস।

নোটবই রাখার কারণ অবসর সময়ে নোট বই দেখে গল্প লেখা। যে কাজটি এখন করতে বসেছি। নসিমন বিবিকে নিয়ে গল্প লিখছি। এটি একটি অতিপ্রাকৃত গল্প। সহজ বাংলায় ভূতের গল্প।

ভূতের গল্প বললেই মনে হবে শিশুতোষ গল্প। যে কারণে অতিপ্রাকৃত গল্প বলছি। যাতে পাঠক বুঝতে পারেন এটা শিশুতোষ গল্প না।

আমি ভূত-প্রেত বিশ্বাস করি না। তারপরেও এক গাদা ভূতের গল্প লিখেছি। এর মধ্যে কিছু বানানো। কিছু অর্ধ সত্য, আবার কিছু সত্য।

সত্যি ভূতের গল্প বলছি বলেই পাঠক ধরে নেবেন না যে, আমি আপনাদের ভূত-প্রেত বিশ্বাস করতে বলছি। কখনোই না। গল্প ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না বলেই ভৌতিক রূপ নিয়েছে।

যে-কোনো ভয়ঙ্কর ভূতের গল্পকে মিসির আলির কাছে নিয়ে গেলে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেবেন ভূত বলে কিছু নেই। সবই ব্যাখ্যার অধীন। সমস্যা হচ্ছে আমাদের সমাজে মিসির আলির সংখ্যা অতি নগণ্য।

যাই হোক, মূল গল্পে চলে যাই।

আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। চল্লিশও হতে পারে। ফরিদপুর জেলার একটি গ্রাম। সেই গ্রামে নসিমন বিবির নিবাস। বয়স পঁচিশ। স্বামী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। নিঃসন্তান দম্পতি। সন্তান নেয়ার অনেক চেষ্টা করেছেন। কোনো চেষ্টাতে ফল হয় নি। স্বামী-স্ত্রীর ভেতর বনিবনা ভালো না। সন্তানহীনাদের স্বামীরা সুনজরে দেখেন না, এই কারণ তো আছেই। তারচে' বড় কারণ— নসিমন বিবির পেশা ধাত্রীগিরি।

গ্রামাঞ্চলে ধাত্রীদের সামাজিক অবস্থান অতি নিচে। সন্তানের জন্মের বিষয়টা সেই সময় গ্রামে নোংরা বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো। সন্তানের জন্মের জন্যে মূল বাড়ির চেয়ে একটু দূরে আঁতুড়ঘর বলে একটা ঘর তৈরি হতো। সেই ঘর চল্লিশ দিন পর ভেঙে দেয়া হতো বা পুড়িয়ে দেয়া হতো। সন্তানের জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত ধাত্রীকে সেই কারণেই নোংরা ভাবা হতো।

তারা থাকতও নোংরাভাবে। ময়লা শাড়ি-কাপড়, মুখভর্তি পান। এরা আসতও অতি দরিদ্র পরিবার থেকে। ভদ্রঘরের কোনো মেয়ে এই কাজ করত না। সন্তানের জন্মের পর তারা একটা শাড়ি পেত, এক ধামা চাল পেত। ছেলে সন্তান হলে বাড়তি পাঁচ দশটা টাকা পেত।

নসিমন বিবি ছিলেন ভদ্রঘরের মেয়ে। খুব সম্ভব ধাত্রীর কাজটা তিনি সমাজসেবা হিসেবে করতেন। কারণ কাজটা করে তিনি কখনো কারো কাছ থেকে কোনো অর্থ বা উপহার নেন নি। সবার সামনে শাড়ি নিতে তিনি লজ্জা পাচ্ছেন ভেবে কেউ কেউ গোপনেও তাঁর কাছে শাড়ি পাঠিয়েছে। তিনি ফেরত দিয়েছেন।

অনেক দূর দূর থেকে তাঁর কাছে লোকজন আসত। কখনো তিনি দূরের পথ বলে কাউকে ফিরিয়ে দেন নি। পাস করা ডাক্তার তখন যে একেবারে ছিল না, তা-না। শহরে-গঞ্জে ছিল। গ্রামের মানুষ পুরুষ ডাক্তারদের এই কাজে ব্যবহার করবে তা কল্পনাও করত না।

নসিমন বিবির বয়স যখন চল্লিশ, তখন তাঁর স্বামী মারা যান সাপের কামড়ে। নসিমন বিবির মাথায় আক্ষরিক অর্থেই আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর কষ্টের জীবন শুরু হয়। অল্প সম্পত্তি। ভাগীদাররা ভাগের অংশ ঠিক মতো দেয় না। আম-কাঁঠালের একটা বাগান ছিল। সে বাগান বেদখল হয়ে যায়। অবস্থা এমন হলো যে, তিনি দু'বেলা খেতে পারেন না।

এই চরম বিপর্যয়ের সময়েও তিনি আগের নীতি বহাল রাখেন। সন্তান প্রসব করাবেন কিন্তু বিনিময়ে কিছু নেবেন না।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি। হাড় কাঁপানো শীত পড়েছে। শীতের সঙ্গে ঘন কুয়াশা। এমন কুয়াশা যে, এক হাত সামনের কিছুও দেখা যায় না। নসিমন বিবির জ্বর। এমন জ্বর যে, বিছানা থেকে নেমে এক গ্লাস পানি খাবেন সেই সামর্থ্যও নেই। তিনি গায়ে একটা কম্বল এবং দু'টা কাঁথা দিয়ে থরথর করে কাঁপছেন। শীত মানছে না। রাত কত তিনি জানেন না। জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে

আছেন। এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। একজন পুরুষ মানুষ কাতর গলায় বলল, মাগো, আমার বড় বিপদ। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

নসিমন বিবি বললেন, জ্বরে আমার শরীর পুড়ে যাচ্ছে। বাবা, আমার পক্ষে বিছানা থেকে নামাই অসম্ভব।

পুরুষ কণ্ঠ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আপনি জীবনে কাউকে ফিরিয়ে দেন নাই। আমার বিপদের সীমা নাই মা। দয়া করেন। সামান্য দয়া।

নসিমন বিবি বলেন, দয়া করার ক্ষমতা আমার নাই। দয়ার মালিক আল্লাহপাক।

বলতে বলতে তিনি বিছানা থেকে নামলেন। গায়ে কম্বল জড়িয়ে দরজা খুললেন। অন্ধকারে চাদর মুড়ি দিয়ে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি তাকে দেখেই বলল, চলেন মা চলেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নসিমন বিবি নিজের শরীর সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সামনের মানুষটাকে অনুসরণ করছেন। চাদর গায়ে মানুষটা আগে আগে যাচ্ছে। তার হাতে না আছে টর্চ, না আছে লণ্ঠন। ঘন কুয়াশায় চারদিকে ঢাকা। তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কোনদিকে যাচ্ছেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না। নসিমন বিবি বলেন, আমি আর হাঁটতে পারতেছি না। এখন আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাব। কথা শেষ করার আগেই তিনি রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। লোকটি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। সে ছুটে এসে বলল, আমি আপনাকে মা ডেকেছি। আমি আপনার ছেলে। ছেলে যদি মা'কে ঘাড়ে তুলে নেয় তাতে কোনো দোষ নেই।

বলেই লোকটা নসিমন বিবিকে তার পিঠে তুলে নিল। এখন লোকটি আর হাঁটছে না, দৌড়াচ্ছে।

এই পর্যায়ে নসিমন বিবি ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর হঠাৎ মনে হলো কোনো মানুষের পক্ষে এইভাবে দৌড়ানো সম্ভব না। তাছাড়া তিনি আশপাশে কোনো ঘরবাড়ি দেখছেন না। গাছপালা দেখছেন না। মনে হচ্ছে লোকটা যেন আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটছে। নসিমন বিবি বললেন, বাবা, তুমি কে?

লোকটা বলল, মা, ভয় পাবেন না। আপনাকে মা ডেকেছি। আমি আপনার ছেলে।

নসিমন বিবি বললেন, কত দূর।

এই তো এসে পড়েছি। চোখ বন্ধ করে থাকেন মা। চোখ বন্ধ করে থাকেন।

প্রচণ্ড আতঙ্কে নসিমন বিবি চোখ বন্ধ করলেন।

যখন তিনি চোখ খুললেন, তখন তিনি একটা পুরনো আমলের দালানের ভেতরের একটা কোঠায় দাঁড়ানো। তাঁর সামনে রেলিং দেয়া পুরনো আমলের পালংক। পালংকে একটি ষোল সতেরো বছরে মেয়ে প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। নসিমন কিছুক্ষণ অভিভূত চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনে এরকম রূপবতী মেয়ে দেখেন নি। মনে হচ্ছে মেয়েটির শরীর রক্ত-মাংসের তৈরি না, মোমের তৈরি।

আশ্চর্যের ব্যাপার ঘরে কোনো আলো নেই। মেয়েটির শরীরের আলোতেই ঘর আলো হয়ে আছে।

নসিমন বিবি বললেন, মাগো, তোমার নাম কী ?

মেয়েটি কাতরাতে কাতরাতে বলল, আমার কোনো নাম নাই। আপনি আমার সন্তানটাকে বাঁচান।

নসিমন বিবি কাজ শুরু করেই থমকে গেলেন। সন্তানের অবস্থান ঠিক না। মাথা উল্টা। মেয়েটাকে সদর হাসপাতালে নেয়া দরকার। ডাক্তাররা ছুরি কাচি দিয়ে যদি কিছু করতে পারেন। মেয়েটা যেন তার মনের কথা বুঝে ফেলল। সে হতাশ গলায় বলল, যা করার আপনাকেই করতে হবে।

নসিমন বিবি সূরা আর রাহমান পাঠ করতে করতে চেষ্টা শুরু করলেন। তলপেটে চাপ দিয়ে একটা পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে কাজ হয়। বেশিরভাগ সময়ই হয় না। তারচে' বড় কথা সন্তানের কোনো নড়াচড়া নেই। সন্তান ইতিমধ্যে মারা গিয়ে থাকলে এই পদ্ধতিতে মায়ের মৃত্যু অবধারিত। নসিমন বিবির মাথা ঘুরতে থাকল। সূরা আর রাহমান পাঠে গণ্ডগোল হয়ে গেল। তিনি সূরা আবার প্রথম থেকে শুরু করলেন। বিশাল জানালা খোলা। খোলা জানালায় বরফের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। ঘরে দ্বিতীয় কেউ নেই। যে তাঁকে নিয়ে এসেছিল, সে এই ঘরে ঢুকে নি।

নসিমন বিবি বললেন, কেউ আছ ? গরম পানি লাগব ?

কেউ জবাব দিল না।

মেয়েটি এখন আর কাতরাচ্ছে না। বড় বড় চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে।

'আল্লাহপাক, তুমি রহম করো' বলে তিনি মেয়েটির তলপেটে হাত রাখলেন। তিনি তাঁর নানিজানের শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, অতি রূপবান এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

নসিমন বিবি বাচ্চাটিকে মা'র পাশে শুইয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

তাঁর যখন জ্ঞান হলো, তখন তিনি ঐ মানুষটার পিঠে। মানুষটা বাতাসের মতো ছুটছে। তাঁর কানের পাশ দিয়ে বরফ ঠাণ্ডা হাওয়া ঝড়ের মতো বইছে। তিনি চলে গেছেন ঘোরের মধ্যে।

মাগো, ঘরে যান।

লোকটি তাঁকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়েছে। তিনি দরজার সামনে দাঁড়ানো। নিজের পরিচিত বাড়িঘর। লোকটি শান্ত গলায় বলল, মা, আপনি কারো কাছ থেকে কিছু নেন না এটা আমি জানি। কিন্তু আপনাকে একটা জিনিস আমি দেব, এটা আপনাকে নিতে হবে।

বলেই লোকটা দরজার সামনের বড়ুই গাছের ডাল ভাঙল। ডালে কয়েকটা বড়ুই ধরে আছে।

মা কোঁচড় মেলেন।

তিনি কিছু না বুঝেই কোঁচড় মেললেন। তাঁর সামনে যে দাঁড়ানো সে রহস্যময় একজন মানুষ কিংবা অন্য কিছু। এর সঙ্গে তর্কে যাওয়ার কোনই কারণ নেই।

নসিমন বিবি কোঁচড়ে বড়ুইয়ের ডাল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কোঁচড় থেকে ডাল ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তাঁর শরীর আর টানছিল না। কোনোকিছু নিয়ে চিন্তা করার মতো মনের অবস্থাও নেই। ঘুমে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া এখন কিছুই করার নেই।

তাঁর ঘুম ভাঙল পরদিন দুপুরে। প্রথমেই চোখ পড়ল বড়ুইয়ের ডালে। রোদের আলো পড়ায় ডালটাকে হলুদ দেখাচ্ছে। হলুদ ডালপালায় হলুদ পাকা বড়ুই। তাঁর বুঝতে অনেক সময় লাগল যে, কোনো ব্যাখ্যাতিত কারণে ভাঙা বড়ুইয়ের ডাল স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে। ডাল সোনার, পাতা সোনার এবং বড়ুইগুলি সোনার।

আমি যখন নসিমন বিবির সঙ্গে দেখা করি, তখন তাঁর বয়স সত্তরের উপর। চোখে তেমন দেখেন না। তবে কান পরিষ্কার। কথাবার্তা বলেন ঝনঝন করে।

আমি বললাম, বুড়িমা, এমন কি হতে পারে যে, প্রবল জ্বরের ঘোরে আপনি স্বপ্ন দেখেছেন। সারাজীবন আপনি সন্তান প্রসব করিয়েছেন। কাজেই আপনার স্বপ্নও ছিল সন্তান প্রসব বিষয়ক।

বুড়ি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, হইতেও পারে। বাবা, আপনের কথা ফেলার উপায় নাই। বিবেচনার কথা। কিন্তু বাবা, সোনার বড়ুইয়ের ডালের কথাও সত্যি। বিক্রি কইরা কইরা সংসার চালাইছি। আমার আত্মীয়-স্বজনরা কিছু নিছে। এরা তাবিজের মতো কোমরে পরত। একটা বড়ুই আর একটা পাতা নিয়েছেন ফরিদপুরের ডিসি সাহেবের স্ত্রী। তয় তিনি নগদ টেকায় খরিদ কইরা নিচ্ছেন।

আপনার কাছে কি কিছুই নাই?

একটা পাতা আছে।

আমাকে দেখাবেন?

না।

না কেন?

বিশ ত্রিশ বছর ধইরা এই পাতা দেখাইতেই আছি। দেখাইতেই আছি। আর কত? গত বছর শীতের সময় আপনের মতো এক ভদ্রলোক আসল। পাতার ছবি তুলল। কত সুন্দর সুন্দর কথা বলল। তারপরে বলল, এই পাতা স্যাকরার দোকানে তৈরি। ঠিক আছে বাবা, তৈরি হইলে তৈরি। আমি বললাম, ঠিক আছে।

তারপর সে পাতা কিনতে চায়। বলে তিনগুণ দাম দিব। আমি বেচব না, সে কিনবেই। হাত থাইকা পাতা ছাড়ে না। তার কাছ থাইকা পাতা বাইর করতে অনেক ঝামেলা হইছে। এরপর থাইক্যা ঠিক করছি— কাউরে দেখাব না। বাবা, আপনি কিছু মনে নিবেন না।

পাপ

পাপ পুণ্য নিয়ে আমার নিজের কিছু সমস্যা আছে। পাপ কি, পুণ্যইবা কি ? যা কল্যাণকর তাই কি পুণ্য ? যা একজনের জন্যে কল্যাণকর তা অন্যের জন্যে অকল্যাণকর হতে পারে। সেখানে পাপ পুণ্য কিভাবে আলাদা করব। আমি পাপ এবং পুণ্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় অনেক গল্প লিখেছি। এর মধ্যে একটি গল্প 'পাপ' আমার খুব পছন্দের। পাঠকদের জন্যে পাপ বিষয়ক তিনটি গল্প দিয়ে দিলাম। পাপ, হাজি মান্না মিয়া, সালাম সাহেবের পাপ। এর মধ্যে পাপ শিরোনামের গল্পটি পুরাতন। সংকলনে একটি পুরানো গল্প ঢুকিয়ে দেবার অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য খারাপ না কিন্তু। পাঠকদের আমার চিন্তার জগৎ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়া।

পাপ বিষয়ে Hilaire Belloc এর একটি লেখা আছে। লেখাটি উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারছি না।

When I am dead
I hope it may be said
"His sins were scarlet, but his books were read."
আমি যখন মারা যাব
আশা করি তখন বলা হবে–
লোকটির পাপগুলো ছিল রঙিন, কিন্তু তার বইগুলো পঠিত হয়েছিল।

ভাই আপনাকে একটা ভয়ঙ্কর পাপের গল্প বলি। পাপটা আমি করেছিলাম। নিজের ইচ্ছায় করি নি। স্ত্রীর কারণে করেছিলাম। স্ত্রীদের কারণে অনেক পাপ পৃথিবীতে হয়েছে। মানুষের আদি পাপও বিবি হাওয়ার কারণে হয়েছিল। আপনাকে এই সব কথা বলা অর্থহীন। আপনি জ্ঞানী মানুষ, আদি পাপের গল্প আপনি জানবেন না তো কে জানবে। যাই হোক মূল গল্পটা বলি।

আমি তখন মাধবখালি ইউনিয়নে মাস্টারি করি। গ্রামের নাম ধলা। ধলা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। নতুন বিবাহ করেছি। স্ত্রী সঙ্গে থাকেন। আমার বয়স তখন পঁচিশের মতো হবে। আমার স্ত্রী নিতান্তই বালিকা। পনেরো-ষোল মতো বয়স। ধলা গ্রামে আমরা প্রথম সংসার পাতলাম। স্কুলের কাছেই অনেকখানি জায়গা নিয়ে আমার টিনের ঘর। আমরা সুখেই ছিলাম। ফুলির গাছগাছালির খুব শখ। সে গাছপালা দিয়ে বাড়ি ভরে ফেলল। ও আচ্ছা, বলতে ভুলে গেছি ফুলি আমার স্ত্রীর ডাক নাম। ভালো নাম নাসিমা খাতুন।

বুঝলেন ভাই সাহেব, ধলা বড় সুন্দর গ্রাম। একেবারে নদীর তীরের গ্রাম। নদীর নাম কাঞ্চন। মাছ খুবই সস্তা। জেলেরা নদী থেকে টাটকা মাছ বাড়িতে দিয়ে যায়। তার স্বাদই অন্য রকম। পনেরো বছর আগের কথা বলছি। এখনো সেখানকার পাবদা মাছের স্বাদ মুখে লেগে আছে। শীতের সময় বোয়াল মাছ থাকত তেলে ভর্তি।

ধলা গ্রামের মানুষজনও খুব মিশুক। আজকাল গ্রাম বলতেই ভিলেজ পলিটিক্সের কথা মনে আসে। দলাদলি মারামারি কাটাকাটি। ধলা গ্রামে এই সব কিছুই ছিল না। শিক্ষক হিসেবে আমার অন্য রকম মর্যাদা ছিল। যে-কোনো বিয়ে শাদিতে আদর করে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যেত। গ্রাম্য সালিসিতে আমার বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হতো। দুই বছর খুব সুখে কাটল। তারপরই সংগ্রাম শুরু হলো। আপনারা বলেন স্বাধীনতা যুদ্ধ। গ্রামের লোকের কাছে সংগ্রাম।

ধলা গ্রাম অনেক ভিতরের দিকে। পাকবাহিনী কোনো দিন ধলা গ্রামে আসবে আমরা চিন্তাই করি নি। কিন্তু জুন মাসের দিকে পাকবাহিনীর গানবোট কাঞ্চন নদী দিয়ে চলাচল শুরু করল। মাধবখালি ইউনিয়নে মিলিটারি ঘাঁটি করল। শুরু করল অত্যাচার। তাদের অত্যাচারের কথা আপনাকে নতুন করে বলার কিছু নাই। আপনি আমার চেয়ে হাজার গুণে বেশি জানেন। আমি শুধু একটা ঘটনা বলি। কাঞ্চন নদীর এক পাড়ে ধলা গ্রাম, অন্য পাড়ে চর হাজরা। জুন মাসের ১৯ তারিখ চর হাজরা গ্রামে মিলিটারির গানবোট ভিড়ল। চর হাজরার বিশিষ্ট মাতবর ইয়াকুব আলী সাহেব মিলিটারিদের খুব সমাদর করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ভাই সাহেব, আপনি এর অন্য অর্থ করবেন না। তখন তাদের সমাদর করে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। সবাইর হাত-পা ছিল বাঁধা। ইয়াকুব আলী সাহেব মিলিটারিদের খুব আদর-যত্ন করলেন। ডাব পেড়ে খাওয়ালেন।

Doridro.com

দুপুরে খানা খাওয়ার জন্যে খাসি জবেহ করলেন। মিলিটারিরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকল। খানাপিনা করল। যাবার সময় ইয়াকুব আলী সাহেবের দুই মেয়ে আর ছেলের বউকে তুলে নিয়ে চলে গেল। আর তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এখন গল্পের মতো মনে হয়। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য। আমার নিজের দেখা। সেই দিনের খানায় শরিক হওয়ার জন্যে ইয়াকুব আলী সাহেব আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। নিয়ে যাবার জন্যে নৌকা পাঠিয়েছিলেন। আমি গিয়েছিলাম।

চর হাজরার ঘটনার পরে আমরা ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লাম। গজবের হাত থেকে বাঁচার জন্যে মসজিদে কোরআন খতম দেয়া হলো। গ্রাম বন্ধ করা হলো। এক লাখ চব্বিশ হাজার বার সুরা এখলাস পাঠ করা হলো। কী যে অশান্তিতে আমাদের দিন গিয়েছে ভাই সাহেব, আপনাকে কী বলব। রাতে এক ফোঁটা ঘুম হতো না। আমার স্ত্রী তখন সন্তান সম্ভবা। সাত মাস চলছে। হাতে নাই একটা পয়সা। স্কুলের বেতন বন্ধ। গ্রামের বাড়ি থেকে যে টাকা পয়সা পাঠাবে সে উপায়ও নাই। দেশে যোগাযোগ বলতে তখন কিছুই নাই। কেউ কারো খোঁজ জানে না। কী যে বিপদে পড়লাম। সোবহানাল্লাহ।

বিপদের উপর বিপদ– জুলাই মাসের শেষের দিকে মুক্তিবাহিনী দেখা দিল। নৌকায় করে আসে, দুই একটা ফুটফাট করে উধাও হয়ে যায়। বিপদে পড়ি আমরা। মিলিটারি এসে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালায়ে দিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর তখন আর কোনো নাড়াচাড়া পাওয়া যায় না। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে অবস্থার পরিবর্তন হলো। মুক্তিবাহিনী তখন শুধু আর ফুটফাট করে না। রীতিমতো যুদ্ধ করে। ভালো যুদ্ধ। বললে বিশ্বাস করবেন না, এরা কাঞ্চন নদীতে মিলিটারির একটা লঞ্চ ডুবায়ে দিল। লঞ্চ ডুবার ঘটনা ঘটল সেপ্টেম্বর মাসের ছাব্বিশ তারিখ। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে এই সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল। ভাই সাহেব হয়তো শুনেছেন। বলা হয়েছিল শতাধিক মিলিটারির প্রাণ সংহার হয়েছে। এটা অবশ্য ঠিক না। মিলিটারি অল্পই ছিল। বেশির ভাগ ছিল রাজাকার। রাজাকারগুলো সাঁতরে পাড়ে উঠেছে, গ্রামের লোকরাই তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস ভাই সাহেব। যুদ্ধ অতি সাধারণ মানুষকেও হিংস্র করে ফেলে। এটা আমার নিজের চোখে দেখা।

এখন মূল গল্পটা আপনাকে বলি। সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখের ঘটনা। মাগরেবের নামাজ পড়ে বারান্দায় বসে আছি। তুমুল বর্ষণ হচ্ছে। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যাটস এন্ড ডগস। একা একা বৃষ্টি দেখছি। আমার

স্ত্রী শোবার ঘরে। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। তার শরীর খুব খারাপ। দুদিন ধরে কিছুই খেতে পারছে না। যা খায় বমি করে দেয়। শরীর অত্যন্ত দুর্বল। কোনো কিছু না ধরে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না। ডাক্তার যে দেখাব সে উপায় নাই। ডাক্তার পাব কই ? মাধবখালিতে একজন এমবিবিএস ডাক্তার ছিলেন– বাবু নলিনীকুমার রায়। ভালো ডাক্তার। মিলিটারি মাধবখালিতে এসে প্রথম দিনই তাকে মেরে ফেলেছে।

যে কথা বলছিলাম, আমি বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছি। মন অত্যন্ত খারাপ।

বৃষ্টির বেগ বাড়তে লাগল। একসময় প্রায় ঝড়ের মতো শুরু হলো। বাড়ি-ঘর কাঁপতে শুরু করলো। আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। পুরানো নড়বড়ে বাড়ি। ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলে অসুস্থ্ স্ত্রীকে নিয়ে বিপদে পড়ব। কাছেই মোক্তার সাহেবের পাকা দালান। স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে উঠব কি-না ভাবছি। তখন ফুলি আমাকে ভেতর থেকে ডাকল। আমি অন্ধকারে ঘরে ঢুকলাম। ফুলি ফিস ফিস করে বলল, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

আমি বললাম, কী কথা ?

ফুলি বলল, আমার কাছে আগে বোস। আমি বসলাম। ফুলি বলল, আমি যদি তোমার কাছে কোনো জিনিস চাই তুমি আমাকে দিবে ?

আমি বললাম, ক্ষমতার ভিতরে থাকলে অবশ্যই দিব। আকাশের চাঁদ চাইলে তো দিতে পারবো না। জিনিসটা কী ?

তুমি আগে আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।

আমি তার কপালে হাত রেখে বললাম, প্রতিজ্ঞা করলাম। এখন বল ব্যাপার কী ?

হারিকেনটা জ্বালাও।

হারিকেন জ্বালালাম। দেখি তার বালিশের কাছে একটা কোরআন শরীফ। আমাকে বলল, আল্লাহপাকের কালাম ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি কথা রাখবে।

আমি ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলাম। ব্যাপার কী ? পোয়াতি অবস্থায় মেয়েদের মধ্যে অনেক পাগলামি ভর করে। আমি ভাবলাম এরকমই কিছু হবে। দেখা যাবে আসল ব্যাপার কিছু না। আমি কোরআন শরীফে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করলাম। তারপর বললাম, এখন বল আমাকে করতে হবে কী ?

একটা মানুষের জীবন রক্ষা করতে হবে।

তার মানে ?

একটা মানুষ আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তার জীবন রক্ষা করতে হবে।

কিছুই বুঝতে পারছি না। কে তোমার কাছে আশ্রয় নিল ?

ফুলি থেমে থেমে চাপা গলায় যা বলল তাতে আমার কলিজা শুকায়ে গেল। দুদিন আগে মিলিটারির লঞ্চডুবি হয়েছে। একটা মিলিটারি নাকি সাঁতরে কূলে উঠেছে। আমাদের বাড়ির পেছন দিকে কলা গাছের ঝোপের আড়ালে বসে ছিল। ফুলিকে দেখে 'বহেনজি' বলে ডাক দিয়ে কেঁদে উঠেছে। ফুলি তাকে আশ্রয় দিয়েছে।

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, দুদিন ধরে একটা মিলিটারি আমার বাড়িতে আছে?

ফুলি বলল, হুঁ।

সত্যি কথা বলছ ?

হ্যাঁ, সত্যি। এখন তুমি তাকে মাধবখালি নিয়ে যাও। মাধবখালিতে মিলিটারি ক্যাম্প আছে। আজ ঝড় বৃষ্টির রাত আছে। অন্ধকারে অন্ধকারে চলে যাও। কেউ টের পাবে না।

তোমার কি মাথাটা খারাপ ?

আমার মাথা খারাপ হোক আর যাই হোক তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ।

আমি মিলিটারি নিয়ে রওনা হব, পথে আমাকে ধরবে মুক্তিবাহিনী। দুইজনকেই গুলি করে মারবে।

এই রকম ঝড় বৃষ্টির রাতে কেউ বের হবে না। তুমি রওনা হয়ে যাও।

ব্যাটা আছে কোথায় ?

আস, তোমাকে দেখাই।

সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কী আছে ?

কিছুই নাই। খালি হাতে সাঁতরে পাড়ে উঠেছিল।

আমি মোটেই ভরসা পেলাম না। অস্ত্র থাকুক আর না থাকুক মিলিটারি বলে কথা। জেনেশুনে এরকম বিপজ্জনক শত্রু শুধুমাত্র মেয়েছেলেদের পক্ষেই ঘরে রাখা সম্ভব। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। আমি ক্ষীণ গলায় বললাম, হারামজাদা কই ?

ফুলি আমাকে দেখাতে নিয়ে গেল। এমনিতে সে কোনো কিছু না ধরে উঠে দাঁড়াতে পারে না। আজ দেখি হারিকেন হাতে গটগট করে যাচ্ছে।

রান্নাঘরের পাশে ভাড়ার ঘর জাতীয় ছোট একটা ঘর আছে। সেখানে চাল, ডাল, পেঁয়াজ-টিয়াজ থাকে। ফুলি আমাকে সেই ঘরের কাছে নিয়ে গেল। দেখি ঘরটা তালাবদ্ধ। একটা মাস্টারলক তালা ঝুলছে। ফুলি তালা খুলল। হারিকেন উঁচু করে ধরলো। দেখি ঘরের কোণায় কম্বল বিছানো। কম্বলের উপর নিতান্তই অল্প বয়েসী একটা ছেলে বসে আছে। তার পরণে আমার লুঙ্গি, আমার পাঞ্জাবি। ঘরের এক কোণায় পানির জগ-গ্লাস। পাকিস্তানি মিলিটারির সাহসের কত গল্প শুনেছি। এখন উল্টা জিনিস দেখলাম। ছেলেটা আমাকে দেখে ভয়ে শিউরে উঠল। গুটিসুটি মেরে গেল। ফুলি তাকে ইশারায় বলল, ভয় নাই।

আমি হারামজাদাকে খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছি। এত কাছ থেকে আগে কোনোদিন মিলিটারি দেখি নি। এই প্রথম দেখছি। লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরা বলেই বোধহয় একে দেখাচ্ছে খুব সাধারণ বাঙালির মতো। শুধু রংটা বেশি ফর্সা আর নাক মুখ কাটা কাটা। আমি ফুলিকে বললাম, এর নাম কী?

ফুলি গড়গড় করে বলল, এর নাম দিলদার, লেফটেন্যান্ট। বাড়ি হলো বালাকোটে। রেশমি নামের ওদের গাঁয়ের একটি মেয়ের সঙ্গে ওর খুব ভাব। যুদ্ধের পর দেশে ফিরে গিয়ে সে মেয়েটাকে বিয়ে করবে। রেশমি যে কত সুন্দর তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। অবিকল ডানাকাটা পরী। রেশমির ছবি দেখবে? দিলদারের পকেটে সবসময় রেশমির ছবি। বালিশের নিচে এই ছবি না রাখলে সে ঘুমতে পারে না।

কারো ছবি দেখারই আমার কোনো শখ ছিল না। আমার মাথা তখন ঘুরছে। একা সমস্যায় পড়লাম। ফুলি তারপরেও ছবি দেখাল। ঘাগরা পরা একটা মেয়ে। মুখ হাসি হাসি। ফুলি বলল, মেয়েটা সুন্দর কেমন, দেখলে?

আমি বললাম, হুঁ।

এখন তুমি ওকে মাধবখালি পৌছে দেবার ব্যবস্থা কর। আজ রাতেই কর।

দেখি।

দেখাদেখির কিছু না। তুমি রওনা হও।

মাধবখালি তো পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে না। নৌকা লাগবে।

নৌকার ব্যবস্থা কর। ওকে পার করার জন্যে আজ রাতই সবচেয়ে ভালো। ভয়ে বেচারা অস্থির হয়ে গেছে। পানি ছাড়া কিছু খেতে পারছে না।

আমি শুকনা গলায় বললাম, দেখি কী করা যায়।

ফুলি মিলিটারির দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বলল, তোমার আর কোনো ভয় নাই। আমার স্বামী তোমাকে নিরাপদে পৌঁছে দিবে। তুমি এখন চারটা ভাত খাও। মিলিটারি বাংলা ভাষার কী বুঝল কে জানে। সে শুধু বলল, শুকরিয়া বহেনজি। লাখো শুকরিয়া।

ফুলি ভাত বেড়ে নিয়ে এলো। তাকে খাওয়াতে বসল। আমাকে বলল, তুমি দেরি করো না– চলে যাও।

আমি ছাতা হাতে বাড়ি থেকে বের হলাম। তখনো ঝুম বৃষ্টি চলছে। তবে বাতাস কমে গেছে। আমি দ্রুত চিন্তা করার চেষ্টা করছি। কী করা যায়, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। স্ত্রীকে কথা দিয়েছি। আল্লাহ্ পাকেরকালাম ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা দরকার। ছেলেটার জন্যে মায়াও লাগছে। বাচ্চা ছেলে। এরা হুকুমের চাকর। উপরওয়ালার হুকুমে চলতে হয়। তাছাড়া বেচারা জীবনই শুরু করে নাই। দেশে ফিরে বিয়ে-শাদি করবে। সুন্দর সংসার হবে। আবার অন্যদিকও আছে। একে মাধবখালি পৌঁছে দিলে ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়বে। নৌকার মাঝিই বলে দিবে। কোনো কিছুই চাপা থাকে না। তারপর রাজাকার হিসাবে আমার বিচার হবে। দেশের মানুষ আমার গায়ে থু দিবে। পাকিস্তানি মিলিটারি শুধু যে আমাদের চরম শত্রু তা না, এরা সাক্ষাৎ শয়তান। এদের কোনো ক্ষমা নাই।

আমি নৌকার খোঁজে গেলাম না। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে গিয়ে খবর দিলাম। রাত দুটার সময় তারা এসে দিলদারকে ধরে নিয়ে গেল। দিলদার আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একবার শুধু বলল, বহেনজি। তারপরই চুপ করে গেল। আমার স্ত্রী অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। দিলদারকে সেই রাতেই গুলি করে মারা হলো। মৃত্যুর আগেও সে কয়েকবার আমার স্ত্রীকে ডাকাল, বহেনজি! বহেনজি!

আমার স্ত্রী মারা গেল সন্তান হতে গিয়ে। একদিক দিয়ে ভালোই হলো। বেঁচে থাকলে সারাজীবন স্বামীকে ঘৃণা করে বাঁচত। সে বাঁচা তো মৃত্যুর চেয়ে খারাপ।

বুঝলেন ভাই সাহেব, যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস। যুদ্ধে শুধু পাপের চাষ হয়। আমার মতো সাধারণ একটা মানুষ কতগুলো পাপ করল চিন্তা করে দেখেন। রোজ হাশরে আমার বিচার হবে। আল্লাহ্ পাক পাপ-পুণ্য কীভাবে বিচার করেন, আমাকে কী শাস্তি দেন এটা আমার দেখার খুব ইচ্ছা।

পাপ-২

হাজি মান্না মিয়া

হাজি মান্না মিয়ার গল্প আমি বড়চাচার মুখে শুনেছি। বড়চাচা রসিক মানুষ ছিলেন, তিনি হাজি মান্না মিয়ার বোকামির গল্পগুলো মজা করে করতেন। আমি তেমন মজা পেতাম না। গ্রামের মানুষদের রসিকতার প্যাটার্নটা আমাকে কখনো আকর্ষণ করে না। হাজি মান্না মিয়াকে নিয়ে প্রচলিত সবচে' মজার গল্পটা বললেই গ্রাম্য রসিকতার প্যাটার্নটা বুঝা যাবে। মান্না মিয়া সপ্তাহে একদিন (বৃহস্পতিবার) রোজা রাখতেন। ক্ষুধা সহ্য করতে পারতেন না বলেই তিনি দুপুরের পর থেকে অস্থির হয়ে পড়তেন। ভেজা গামছা মাথায় দিয়ে পাটি পেতে গাছতলায় বসে থাকতেন। তখন যার সঙ্গে উনার দেখা হতো উনি বলতেন, প্রতি সপ্তাহের একদিন রোজা রাখতে হবে এমন কোনো বিধান নাই। এই শেষ, রোজা আর রাখব না। ইফতারের টাইম হবার আগেই তিনি আযান দিয়ে রোজা ভেঙে ফেলতেন। পরের বৃহস্পতিবার আবার রোজা রাখা হতো।

আমার কাছ থেকে হাজি মান্না মিয়ার এই গল্প শুনে বাবা খুব রাগ করলেন। তিনি কঠিন গলায় বললেন, হাজি সাহেবকে নিয়ে কখনো যেন এ ধরনের কথা বলা না হয়। উনি আমার শিক্ষক। আমি উনার কাছ থেকে কোরআন পাঠ শিখেছি। উনার মতো সুফি মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি নি।

বাবা নিষেধ করেছেন বলেই হাজি মান্না মিয়ার গল্প বন্ধ হবে তা-না। যতবারই গ্রামের বাড়িতে যাই বড়চাচা কোনো না কোনো গল্প ফাঁদেন। একবার শুনলাম তাঁর বিয়ের গল্প। সত্তর বছরে তাঁর না-কি বিয়ের শখ হলো। কোনো বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেলে উঁকি ঝুঁকি মেরে বাড়িতে সেয়ানা মেয়ে আছে কি-না দেখার চেষ্টা করেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে পান মুখে

Doridro.com

দিতে দিতে বলেন— বাড়িতে কি বিবাহযোগ্য কোনো মেয়ে আছে ? বাড়ির লোকজন বলত, পাত্র কে ? হাজি মান্না মিয়া বলতেন, আমিই পাত্র।

হাজি মান্না মিয়ার বিবাহ সংক্রান্ত গল্প যখন বাবার কানে তোলা হলো (আমিই তুললাম) তখন বাবা বললেন, ঘটনা সত্যি কিন্তু অর্ধেক সত্যি। হাজি মান্না মিয়াকে বুঝতে হলে পুরো গল্প শুনতে হবে। হাফ ট্রুথ মিথ্যার চেয়েও খারাপ।

বাবার কাছ থেকে হাজি মান্না মিয়ার পুরো গল্প আমি শুনেছি। এক বৈঠকে শুনতে পেলে ভালো হতো, সেটা সম্ভব হয় নি, ভেঙে ভেঙে শুনেছি। আজ হাজি মান্না মিয়ার গল্প বাবার মতো করেই বলার চেষ্টা করছি। পাঠকেরা পছন্দ করবেন কি-না জানি না। পাঠকেরা জটিল গল্প পছন্দ করেন। হাজি মান্না মিয়া জটিলতা বিহীন মানুষ। তাঁকে নিয়ে জটিল গল্প ফাঁদা সম্ভব না।

ইংরেজি উনিশশ তিরিশ সনের এক চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় মান্না মিয়া বগলে একটা কম্বল এবং হাতে চটের বিশাল ব্যাগ নিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে (কুতুবপুর, নেত্রকোনা) উপস্থিত হলো। তাঁর বয়স ষাটের উপর। মুখভর্তি সাদা দাড়ি। মাথায় বেতের টুপি। শক্ত সমর্থ চেহারা। তিনি অতি বিনয়ের সঙ্গে গ্রামের মসজিদে রাত কাটাবার প্রস্তাব দিলেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তাঁর শুধু থাকার সমস্যা।

মসজিদের ইমাম সাহেব বললেন, আজ রাতটা থাকবেন? মসজিদে থাকার দরকার কী? আমার বাড়িতে থাকেন।

মান্না মিয়া বললেন, আপনার দরবারে হাজার শুকরিয়া। আমি শুধু আজ রাতটা থাকব না। বাকি জীবন থাকব। আমি বিরাট একটা পাপ করেছি। এই জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছি বাকি জীবন মসজিদে থাকব। পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।

ইমাম সাহেব বললেন, কী পাপ করেছেন?

মান্না মিয়া বিচলিত গলায় বললেন, কী পাপ করেছি এটা আমি জানি না। আল্লাহপাক জানেন। তিনি সর্বজ্ঞানী।

কী পাপ করেছেন আপনি জানেন না ?

জি-না জনাব।

আপনার দেশ কোথায় ? আপনি কোত্থেকে এসেছেন ?

সেইটাও জনাব আমি আপনাদের বলব না।

বলবেন না কেন ?

আমার বলতে ইচ্ছা করে না এইজন্য বলব না। যদি কোনোদিন বলতে ইচ্ছা করে তখন বলব। আপনারা যদি আমাকে থাকতে দেন তাহলে থাকব। যদি না দেন অন্য কোনো জায়গার অনুসন্ধান করব।

আপনি কি অনেক জায়গায় গিয়েছেন ?

জি জনাব। কেউ রাজি হয় নাই।

মসজিদের ইমাম সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, ঠিক আছে আজকের রাতটা থাকুন। আমি গ্রামের মুরব্বিদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে দেখি কী করা যায়।

মান্না মিয়া বললেন, জনাব বহুত শুকরিয়া।

মান্না মিয়া গ্রামের মসজিদে স্থায়ী হয়ে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সবাই তাঁর গল্প জেনে গেল। জটিল কোনো গল্প না। খুবই সরল গল্প। মান্না মিয়ার বাড়ি ভাটি অঞ্চলে। ঠিক কোন জায়গা সেটা তিনি কোনোদিনই বলেন নি। একরাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন হজ্ব করছেন। কাবা শরীফের চারপাশে ঘুরছেন। স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল, তিনি খুবই অস্থির বোধ করলেন। কারণ তিনি হতদরিদ্র মানুষ। হজ্বে কীভাবে যাবেন ? খরচ পাবেন কোথায় ?

তাঁর গ্রামের মানুষরা তাঁর স্বপ্নের কথা শুনল এবং তারাই চাঁদা তুলে হজ্বে যাবার খরচ সংগ্রহ করল। তাঁর অঞ্চলের মানুষরা খুবই উৎসাহী। তাদের অঞ্চলের প্রথম হাজি।

সেই সময় হজ্ব যাত্রাও ছিল দুরূহ। পাসপোর্টের প্রচলন ছিল না। পারমিট দেয়া হতো বোম্বাই শহরে। সেখান থেকে জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা। অনেকে বোম্বাই পর্যন্ত যেতেন, শেষমুহূর্তে জাহাজে উঠতে পারতেন না। অসুস্থ হয়ে পড়তেন, কিংবা জাহাজ ছেড়ে দিত। তাঁরা নিজ অঞ্চলে ফিরে এসে হাজিদের মতোই জীবন যাপন করতেন। তাঁদেরকে বলা হতো 'বোম্বাই হাজি'। অঞ্চলের মানুষরা তাদেরকেও যথার্থ সম্মান করত।

মান্না মিয়া তাঁর অঞ্চল থেকে নৌকায় এবং পায়ে হেঁটে নেত্রকোনায় উপস্থিত হলেন। নেত্রকোনা থেকে ট্রেনে করে যাবেন গোয়ালন্দ। সেখান থেকে স্টিমারে কোলকাতা। কোলকাতা থেকে আবার ট্রেনে করে বোম্বাই শহর। দীর্ঘ ভ্রমণ।

তাঁর অঞ্চলের লোকজন তাঁকে অতি সমাদরে ট্রেনে তুলে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বিদায় নিল। ট্রেন ছেড়ে দেবার পর তিনি লক্ষ করলেন তাঁর কোমরে বাঁধা টাকার খুঁতি (টাকা রাখার কাপড়ের ব্যাগ। ফিতা দিয়ে কোমরে বাঁধা থাকে) নেই। কখন কোমর থেকে ফিতা খুলে পড়ে গেছে তিনি জানেন না। মান্না মিয়ার মনে হলো তিনি নিশ্চয়ই তাঁর অজ্ঞাতে কোনো কঠিন পাপ করেছেন। যে কারণে আল্লাহপাক শেষ মুহূর্তে তাঁর হজ্ব যাত্রা বাতিল করেছেন।

ট্রেন কোনো একটা স্টেশনে থামল। তিনি কম্বল এবং চটের বস্তা হাতে অচেনা অজানা এক স্টেশনে নেমে পড়লেন। প্রতিজ্ঞা করলেন বাকি জীবন তিনি তাঁর অজ্ঞাত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহপাক যদি ক্ষমা করেন তাহলে তিনিই আবার হজ্বের ব্যবস্থা করবেন। মান্না মিয়া তখনই নিজের অঞ্চলে ফিরবেন। তাঁর নামের আগে থাকবে হাজি।

মান্না মিয়ার বাকি গল্প অতি সরল। তিনি থাকতেন মসজিদে। দিনরাত নামায কালাম পড়তেন। মসজিদের পাশে অতি টক (প্রায় বিষাক্ত) এক বড়ুই গাছের নিচে বসে তসবি টানতেন। গ্রামের ছেলেমেয়েরা ভোরবেলায় তাঁর কাছে কোরআন পাঠ শিখত। একেক দিন একেক জনের বাড়ি থেকে তাঁর খাবার আসত।

মান্না মিয়া অজ্ঞাত পাপের সন্ধানেই তার বেশির ভাগ সময় ব্যয় করতেন। একসময় তাঁর মনে হলো ইসলাম ধর্মে বৈরাগ্যের স্থান নেই, অথচ তিনি চিরকুমার। এই অপরাধই হয়তো তাঁর অপরাধ। তখন তিনি হঠাৎ করেই বিয়ে করার জন্য ব্যস্ত হলেন।

একবার তাঁর মনে হলো তিনি শিশুদের তেমন পছন্দ করেন না, অথচ নবী করিম (সঃ) শিশুদের খুবই পছন্দ করতেন, এটাই হয়তো তাঁর অপরাধ। তিনি হঠাৎ শিশুদের জন্য ব্যস্ত হলেন। বাড়িতে বাড়িতে শিশুদের সন্ধানে যাওয়া, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া তাঁর দৈনিক রুটিন হয়ে দাঁড়াল।

ছয় বছর এইভাবে কেটে গেল। সপ্তম বর্ষের শুরুতে আমাদের গ্রামের মানুষেরা চাঁদা তুলতে শুরু করল। তারা মান্না মিয়াকে হজ্বে পাঠাবে। বেচারার জীবনের একটা মাত্র শখ পূরণ করা হবে। আমাদের গ্রাম হতদরিদ্র, তারপরেও এক বছরের মধ্যেই টাকা উঠে গেল। ঠিক করা হলো গ্রামের একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি মান্না মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বাই পর্যন্ত যাবেন। জাহাজে তুলে দিয়ে ফিরে আসবেন।

মান্না মিয়া সেবারও যেতে পারলেন না। যাবার দু'দিন আগে কঠিন অসুখে পড়ে গেলেন। মান্না মিয়া কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আল্লাহ পাক আমার অপরাধ এখনো ক্ষমা করেন নি।

তারপরের বছর বর্ষাকালে মান্না মিয়া মারা যান। মৃত্যুর আগে আগে তিনি খুবই আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন আল্লাহপাক তাঁর হজ্ব কবুল করেছেন। এখন তাঁর গ্রামে ফিরতে আর বাধা নেই। নামের আগে হাজি লিখতেও সমস্যা নেই।

মান্না মিয়ার শবদেহ তাঁর গ্রামের বাড়ি ভাটিপাড়ায় (সুনামগঞ্জ) পৌঁছে দেয়া হয়। অঞ্চলের মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় শবদেহ গ্রহণ করে। তাকে কবর দেয়া হয় স্থানীয় মসজিদের পাশে।

হাজি মান্না মিয়ার গল্প শেষ হলো। আমার নিজের কথা শেষ হয়নি। আমার ভেতর অনেক ধরনের প্রশ্ন। স্বপ্নকে আমরা কতটুকু গুরুত্ব দেব। স্বপ্ন মানেই তো ইচ্ছাপূরণ। না-কি ইচ্ছাপূরণের বাইরেও কিছু আছে ?

মান্না মিয়া বড় ধরনের কোনো অপরাধ কি সত্যিই করেছিলেন ? যে মানুষ কখনো কোনো অপরাধ করে নি সে নিজেকে মহাঅপরাধী ভাববে এত বোকা তো মানুষ না। মান্না মিয়া যে অপরাধটা করেছিলেন সেটা তাহলে কী? সাধু মানুষ কখনো পালায় না, অপরাধীরাই পালিয়ে বেড়ায়। মান্না মিয়াও নিজ অঞ্চলে না গিয়ে আমাদের অঞ্চলেই পালিয়ে এসেছিলেন।

তারপরেও কিছু সমস্যা থেকেও যায়, যেমন বড়ুই গাছ বিষয়ক জটিলতা। গল্পে একটি বড়ুই গাছের কথা উল্লেখ করেছি। যে গাছের কড়ুইয়ের স্বাদ তিতা। মুখে দিলে থু করে ফেলে দিতে হয়। মান্না মিয়া যে গাছের নিচে বসে সারাদিন তসবি টানতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পর গাছের বড়ুইয়ের গুণগত পরিবর্তন হয়। বড়ুই হয়ে যায় মধুর মতো মিষ্টি। সেই বড়ুই আমি নিজেও খেয়ে দেখেছি। তবে এরও নিশ্চয়ই কোনো ব্যাখ্যা আছে। কিংবা ব্যাখ্যা নেই। আমরা ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যাহীন এক জগতে বাস করে হিসাব মিলাতে চাই। কোনো হিসাবই কখনো মিলে না।

পাপ-৩

সালাম সাহেবের পাপ

মিসির আলি আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, 'অবসেশন' শব্দটার বাংলা কী বলুন তো!

আমি খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেলাম। চট করে মাথায় কিছু আসছে না। তাই তো, অবসেশনের ঠিক বাংলাটি কী ?

মিসির আলি মিটিমিটি হাসছেন। সচরাচর তাঁকে হাসতে দেখা যায় না। তাঁর হাসি দেখে ভালো লাগছে। বেচারা দীর্ঘদিন রোগভোগ করে কাহিল হয়ে আছেন। পনেরো দিন পর গতকাল প্রথম শিং মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছেন। আমি গিয়েছি রোগী দেখতে।

মিসির আলি আবার বললেন, অবসেশনের বাংলা বলতে পারছেন না, তাই না ?

আমি বললাম, মাথায় আসছে। মুখে আসছে না।

মিসির আলি বললেন, ইংরেজি অনেক শব্দ আছে যার সঠিক বাংলা নেই। আবার অনেক বাংলা শব্দও আছে যার ইংরেজি হয় না। যেমন— 'অভিমান'। অভিমানের ইংরেজি বলতে পারবেন ?

আমি বললাম, ভাষাতত্ত্ব থাকুক, আপনার শরীর কেমন বলুন।

মিসির আলি বললেন, শরীর সেরে গেছে। এইজন্যে মনটা সামান্য খারাপ। শরীর সারায় মন খারাপ কেন ?

মিসির আলি বললেন, শরীর যখন খুব খারাপ থাকে তখন মনের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। ঘোরলাগা ভাব তৈরি হয়। এই অবস্থাটা আমার পছন্দের। ঘোরলাগা অবস্থায় কোনো কিছু ভাবতে ভালো লাগে।

আমি বললাম, চেষ্টা করুন আবার যেন অসুখে পড়তে পারেন। শীতের সময় আছে, ধানমণ্ডি লেকের নোংরা পনিতে ডুব দিয়ে এলে কেমন হয় ?

খারাপ হয় না। চলুন যাই।

মিসির আলি খাট থেকে নেমে গেলেন। আমি আঁৎকে উঠলাম। উনি কি সত্যি লেকে গোসল করার কথা ভাবছেন ? মিসির আলী জাতীয় মানুষরা উদ্ভট কর্মকাণ্ড পছন্দ করে। আমি বললাম, যাচ্ছেন কোথায় ?

মিসির আলী বললেন, আপনাকে একজন মানুষের ছবি দেখাব।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলাম। মিসির আলী বললেন, আপনি কী ভেবেছিলেন ? লেকে গোসল করার জন্য টাওয়েল আনতে যাচ্ছি?

আপনাকে দ্রুত খাট থেকে নামতে দেখে সেরকমই ভেবেছি।

আমি খুবই সাধারণ মানুষ। 'অ্যাকসেনট্রিক' কেউ না। আমি একজন অ্যাকসেনট্রিক মানুষের ছবি আপনাকে দেখাব। ভালো কথা, 'অ্যাকসেনট্রিক' শব্দটার বাংলা বলুন তো ?

আমার হাতে একজন বুড়ো মানুষের সাদাকালো ছবি। মাথাভর্তি আইনস্টাইনের মতো চুল। সব চুল সাদা। বড় বড় চোখ। তিনি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন।

মিসির আলী বললেন, ছবি দেখে লোকটাকে কেমন মনে হচ্ছে?

ভালোমানুষ মনে হচ্ছে।

ভালোমানুষ মনে হচ্ছে কেন? চোখ বড় সেই জন্যে ? সরু চোখের মানুষরা ভালো হয় না ? সব জাপানি কি খারাপ ?

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে কূটতর্কে যেতে চাচ্ছি না। কী বলবেন বলুন।

মিসির আলী বললেন, ভদ্রলোকের নাম মোহম্মদ সালাম। কৃষি ব্যাংকে কাজ করতেন। এখন রিটায়ার করেছেন। অতি ভালোমানুষ। দুই ছেলে এক মেয়ে এবং স্ত্রী নিয়ে সুখী সংসার। তাঁর বড় ছেলেটি ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়।

ভদ্রলোকের ছবি নিয়ে ঘুরছেন কেন ?

একটু আগে 'অবসেশন' শব্দটা নিয়ে কথা বললাম না ? ঐ ভদ্রলোকের একটা ভয়াবহ অবসেশন আছে। যখন আমি অসুখে পড়েছিলাম তখন ভদ্রলোকের অবসেশনটা নিয়েই ভেবেছি। তাঁর অবসেশনের গল্পটা শুনবেন?

শোনার মতো হলে শুনতে পারি।

শোনার মতো তো বটেই, তবে ছোট্ট সমস্যা আছে।

কী সমস্যা ?

ভদ্রলোকের গল্প শুনলে তাঁর অবসেশন আপনার ভেতর ঢুকে যেতে পারে। তার ফল শুভ হবে না।

গল্পটা বলুন।

মিসির আলী বললেন, চা বানিয়ে আনি। চা খেতে খেতে বলি। আপনি খাটে পা উঠিয়ে আরাম করে বসুন।

আমি আরাম করে বসেছি। চা খাচ্ছি। রাত নয়টার মতো বাজে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। মিসির আলী খাটে হেলান দিয়ে গল্প বলছেন।

মোহাম্মদ সালাম সাহেব এরকম এক বর্ষার রাতে বাড়ির সবাইকে নিয়ে টিভিতে কী একটা নাটক দেখছিলেন। হাসির কোনো নাটক। সবাই হাসছে। তিনিও হাসছেন। নাটকের মাঝখানে হঠাৎ তিনি উঠে বারান্দায় চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ হলো তিনি ফিরছেন না। তাঁর স্ত্রী, উনার নাম মহল, স্বামীর সন্ধানে বারান্দায় এসে দেখেন— ভদ্রলোক বেতের চেয়ারে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন।

মহল বললেন, কী হয়েছে? নাটক দেখবে না ?

সালাম সাহেব জবাব দিলেন না। তাঁর চোখ চকচক করছে। মহল বিস্মিত হয়ে বললেন, কাঁদছ না-কি ?

সালাম সাহেব চাপা গলায় বললেন, মহল, আমি আমার জীবনে ভয়ঙ্কর একটা অপরাধ করেছি। অপরাধের প্রায়শ্চিত্য করা দরকার। আমি কাল থেকে প্রায়শ্চিত্য শুরু করব।

মহল বললেন, কী অপরাধ করেছ ?

সালাম জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে রাখলেন।

মহল বললেন, অফিসের টাকা পয়সা মেরে দিয়েছ ?

সালাম বললেন, ছি! তুমি আমাকে চেনো না।

মহল বললেন, তাহলে কী ? অফিসের কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে? তাকে নিয়ে হোটেল ফোটেলে গেছ ? রুম ভাড়া করেছ ?

সালাম বললেন, ছি ছি!

মহল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে উঠে আস।

সালাম বললেন, না।

মহল বললেন, নাটক না দেখলে ভাত খেতে আস। ঝিম ধরে বসে থাকবে না।

সালাম সাহেব উঠে গেলেন। স্বাভাবিকভাবে ভাত খেলেন। জর্দা দিয়ে পান খেলেন। দিনের শেষ সিগারেট খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। মাঝরাতে মহলের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন সালাম শোবার ঘরের কাঠের চেয়ারে জবুথবু হয়ে বসে আছেন। মহল বললেন, এই কী হয়েছে?

সালাম বললেন, কিছু না।

চেয়ারে বসে আছ কেন?

ঘুম আসছে না।

ঘুম আসছে না কেন?

পাপটা মাথায় ঘুরছে। ভয়ঙ্কর একটা পাপ করেছি মহল।

মহল বললেন, খুন করেছ কাউকে?

সালাম বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি খুন করব মানে? কাকে খুন করব?

মহল বললেন, পাপটা তাহলে কী? বলো আমাকে?

সালাম মাথা নিচু করে রইলেন। কিছু বললেন না।

মহল বললেন, ঘুমের ওষুধ দেই, খেয়ে ঘুমাও।

সালাম বললেন, দাও।

তিনি দু'টা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েও সারারাত জেগে বসে রইলেন। তাঁর সমস্যা সে-রাত থেকেই শুরু হলো।

চাকরি শেষ হবার আগেই রিটায়ারমেন্টে চলে গেলেন। আলাদা ঘরে বাস করতে লাগলেন। সারাদিন একা থাকেন। কারো সঙ্গে কথা বলেন না। রাতে ঘুমান না। তাঁকে বড় বড় সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো হলো। সাইকিয়াট্রিস্টরা রোগ ধরতে পারলেন। রোগের নাম অ্যাকিউট অবসেশন। কোনো একটা বিষয় মাথার ভেতর গভীরভাবে গেঁথে গেছে। এই রোগ সারাতে হলে পাপটা কী তা জানতে হবে? সালাম সাহেব এই বিষয়ে কিছুই বলবেন না। তাঁর স্ত্রী নানানভাবে চেষ্টা করলেন। যেমন—

মহল : শোন, তুমি কি বাসার কাজের মেয়ের সঙ্গে কিছু করেছ? করে থাকলে বলো। আমি কিছুই মনে করব না।

সালাম : ছি মহল, ছি! আমি কি এত ছোট!

মহল : অফিসের গাড়ি নিয়ে আসার সময় গাড়ির ড্রাইভার কাউকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে ?

সালাম : না।

মহল : আচ্ছা শোন! তুমি কি সমকামী ? এই নিয়ে কোনো সমস্যা ?

সালাম : মহল, তুমি আমাকে নিয়ে এত নোংরা চিন্তা কীভাবে করছ ?

এই পর্যায়ে সালাম সাহেবের স্ত্রী আমার কাছে কেঁদে পড়লেন। তাঁর ধারণা আমি কথা বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি ভদ্রলোককে নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত হলেন। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। সাধারণ কথাবার্তা। আমি তাঁকে চা খেতে দিলাম। তিনি আগ্রহ নিয়ে চা খেলেন। আমি বললাম, ভাই পাপের ডেফিনেশন কী ? কোনটাকে আপনি পাপ ভাবেন ?

তিনি বললেন, যেটা ইমমোরাল সেটাই পাপ।

আমি বললাম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মোরালিটি বদলায়। একটা সময় ছিল যখন বিবাহ নামের ইনস্টিটিউশন তৈরি হত না। তখন যে-কোনো ছেলে যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘুমুতে পারত। কেউ বিষয়টাকে ইমমোরাল ভাবত না। এখন ভাবে।

সালাম সাহেব বললেন, আপনার কথা বুঝতে পারছি।

আমি বললাম, আপনি কি কোনো ইমমোরাল কাজ করেছেন ?

তিনি বললেন, জি-না, তবে তার চেয়েও অনেক বড় পাপ করেছি।

সেটা কি আপনি বলবেন না ?

জি-না।

আপনার কারণে আপনার স্ত্রী কষ্ট পাচ্ছেন। আপনার বাচ্চারা কষ্ট পাচ্ছে। এটাকে কি আপনার পাপ বলে মনে হয় ?

সালাম সাহেব বললেন, জি পাপ। তবে আমি যে পাপ করেছি তার চেয়ে অনেক ছোট পাপ।

এখন পাপের প্রায়শ্চিত্য করছেন ?

জি। যেদিন প্রায়শ্চিত্য শেষ হবে সেদিনই আমি স্বাভাবিক হয়ে যাব। আমি আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

তিনি কি ক্ষমা করবেন ?

বুঝতে পারছি না। যে ভয়ঙ্কর পাপ করেছি ক্ষমা পাওয়ার কথা না। তারপরেও তিনি রহমানুর রাহিম।

সালাম সাহেব এক পর্যায়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি চলে গেলেন। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ির সামনের কাঁঠাল গাছের নিচে পাটি পেতে বসে থাকেন। খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ।

মিসির আলী বললেন, গল্প শেষ।

আমি অবাক হয়ে বললাম, গল্প শেষ মানে? সালাম সাহেবের কী হলো? উনি পাপটা কী করেছেন বলবেন না?

মিসির আলী হাই তুলতে তুলতে বললেন, সালাম সাহেবের বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তবে পাপটা কী সেটা মনে হয় জানি। অসুস্থ অবস্থায় যখন বিছানায় পড়েছিলাম তখন চিন্তা করে বের করেছি।

আমি বললাম, বলুন শুনি।

মিসির আলী বললেন, আমি গল্পের শুরুতেই বলেছিলাম সালাম সাহেবের গল্পটা আপনার মাথায় ঢুকে গেছে। এই গল্প মাথায় নিয়ে আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। অসংখ্যবার আপনার মনে হবে সালাম সাহেব পাপটা কী করেছিলেন। উত্তর পাবেন না।

আমি বললাম, আপনি সত্যি বলবেন না?

মিসির আলী গম্ভীর গলায় বললেন, না।

দৌলত শাহ্'র অদ্ভুত কাহিনী

লেখালেখির শুরুর দিকে প্রুফ দেখতে আমাকে বাংলাবাজার যেতে হত। প্রকাশকরা ভয়ংকর মিষ্টি স্বর ভাসা চা দিয়ে আমাকে এক কোণায় বসিয়ে দিতেন। প্রকাশকদের মধ্যে যারা দয়ালু তারা একবার জিজ্ঞেস করতেন, নাশতা কিছু খাবেন ? আনিয়ে দেব ?

পেটে ক্ষুধা থাকলেও চক্ষু লজ্জায় কখনোই বলতে পারতাম না– নাশতা খাব। গলির মোড়ে গরম গরম সিঙ্গাড়া ভাজছে দু'টা সিঙ্গাড়া খাব।

দৌলত শাহ্‌র অদ্ভুত কাহিনীর নায়ক আসলে আমি নিজে। দৌলত শাহ্ একজন প্রুফ রিডার। আমিও প্রুফ রিডার। তফাৎ একটাই আমি নিজের উপন্যাসের প্রুফ দেখি। দৌলত শাহ্ অবিবাহিত। আমিও তাই— তখনো বিয়ে করি নি। কল্পনায় অতি রূপবতী তরুণীর ছবি। যার সঙ্গে জীবন-যাপন করব কিন্তু সেই রূপবতীকে পুরোপুরি চিনব না। সে থেকে যাবে অধরা।

এই ভৌতিক গল্পেও তাই হয়েছে। আমি গল্পটি লিখে আনন্দ পেয়েছি। আনন্দের প্রধান কারণ গল্প লিখতে গিয়ে পুরানো ঢাকার বাংলাবাজার এলাকায় ফিরে যেতে পেরেছিলাম। টাইম মেশিনে চড়ে নষ্টালজিক অতীত ভ্রমণ।

স্যার, আমার নাম দৌলত শাহ্। এটা আমার আসল নাম না। আসল নাম ধন মিয়া। এসএসসি পরীক্ষার আগে নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়। হেড স্যার আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, বাবা তোমার নামটা তো ভালো না। অনেক অঞ্চলে নেংটুকে বলে 'ধন'। অর্থ ঠিক রেখে নামটা বদলে দেই ?

আমি বললাম, জি আচ্ছা স্যার।

তিনি নামের শেষে শাহ্ টাইটেল দিয়ে দিলেন।

ছিলাম ধন মিয়া, হয়ে গেলাম দৌলত শাহ্। হেড স্যার আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর বাড়িতে থেকেই আমি এসএসসি পাস করি। সায়েন্সে ইন্টারমিডিয়েট পাস করি। আমার বাড়িঘর ছিল না, থাকার জায়গা ছিল না। ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট বের হবার পর হেড স্যার বললেন, তুমি দু'টা পরীক্ষাতেই ভালো রেজাল্ট করেছ। তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে পড়াই এই সামর্থ্য আমার নাই। ঢাকার বাংলাবাজারে থাকেন এক লোককে আমি সামান্য চিনি। তাকে পত্র লিখে দেই। দেখ তিনি কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন কি-না। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা যদি করে দেন, একটা দু'টা টিউশনি।

আমি বললাম, জি আচ্ছা স্যার।

হেড স্যার বললেন, দেখ কষ্ট করে লেখাপড়াটা শেষ করতে পার কি-না। বিদ্যাসাগর ল্যাম্পপোস্টের আলোয় লেখাপড়া করে বিদ্যার সাগর উপাধি পেয়েছেন। বুঝেছ?

আমি বললাম, জি স্যার।

নগদ একশ সত্তর টাকা, একটা টিনের ট্রাঙ্ক এবং একটা পাটের ব্যাগ নিয়ে ঢাকায় উপস্থিত হলাম।

মোবারক উদ্দিন সাহেবকে খুঁজে বের করে হেড স্যারের চিঠি তাঁর হাতে দিলাম। মোবারক উদ্দিন একটা ছাপাখানার মালিক। ছাপাখানার নাম মিশন প্রেস। তাঁর প্রকাশনা সংস্থা আছে। সেখান থেকে ধর্মের বই এবং সেক্সের বই বের হয়। সেক্সের বইগুলো গোপনে বিক্রি হয়। সবচে' বেশি বিক্রি হয় যে বই তার নাম 'ভাবি-দেবরের কামলীলা'। বইয়ের ভেতরে অনেকগুলো খারাপ খারাপ ছবি আছে। স্যার, আপনি দেখেছেন কি-না জানি না। মনে হয় দেখেন নাই। এইসব বই ভদ্রসমাজের জন্য না।

মোবারক উদ্দিন মানুষটা ছোটখাটো কিন্তু হাতির মতো শরীর। সারাক্ষণ ঘামেন। তাঁর গরম বেশি বলে গায়ে কাপড় রাখতে পারেন না। খালি গায়ে থাকেন। একটা গামছা জড়ানো থাকে। এই গামছায় একটু পর পর মুখ মোছেন। মোবারক উদ্দিন বললেন, তোমার নাম দৌলত শাহ্?

আমি বললাম, জি স্যার।

তিনি বললেন, আমাকে স্যার বলবা না। আমি মাস্টারও না, অফিসারও না। আমাকে বস ডাকবা।

জি আচ্ছা।

হেড মাস্টার সাব চিঠি দিয়ে আমাকে ফেলেছেন বিপদে। আমার বাড়িটা হোটেল না, এতিমখানাও না। বুঝেছ?

জি স্যার।

আবার স্যার। মারব থাপ্পড়। বলো 'জি বস'।

জি বস।

তারপরেও হেড স্যারের চিঠির অমর্যাদা আমি করি না। আমি যার নুন খাই তার গুণ গাই। কিছুদিন হেড স্যারের নুন খেয়েছি। তুমি এক কাজ করো, এক সপ্তাহ পরে আস, দেখি থাকার কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কি-না।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, এই এক সপ্তাহ কই থাকব ?

তিনি রেগে গিয়ে বললেন, এই এক সপ্তাহ কই থাকবা সেটা তুমি জানো। আমার কথা শেষ, এখন বিদায় হও।

ঢাকা শহরে আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। হোটেলে থাকার মতো পয়সাও নাই। কী করব বুঝতে পারলাম না। প্রেসের সামনে একটা বেঞ্চি পাতা ছিল। সেই বেঞ্চিতে বসে রইলাম। দুপুরে কাছেই একটা রেস্টুরেন্ট থেকে দু'টা পরোটা আর বুটের ডাল কিনে খেলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার বেঞ্চিতে বসলাম। প্রেস রাত বারোটার সময় বন্ধ হলো। ভেবেছিলাম কেউ একজন বলবে রাতটা প্রেসের ভেতর কাটিয়ে দিতে। কেউ কিছু বলল না। তারা বেঞ্চ ভেতরে ঢুকিয়ে তালা মেরে চলে গেল। ঢাকা শহরে আমার প্রথম রাত কাটল মিশন প্রেসের সামনে হাঁটাহাঁটি করে। প্রেসের সামনে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে বলে জায়গাটা আলো হয়ে আছে। হাতে কোনো বই থাকলে ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বই পড়ে রাত কাটিয়ে দিতে পারতাম। সঙ্গে কোনো বই ছিল না।

পরদিন সকাল এগারোটার দিকে মোবারক উদ্দিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। অতি বিরক্ত গলায় বললেন, রাতে কোথায় ছিলা ? শুনলাম প্রেসের সামনে হাঁটাহাঁটি করেছ ?

আমি বললাম, জি বস।

প্রুফ রিডিং-এর কাজ জানো ?

জি-না।

বানান জানলেই প্রুফ রিডিং-এর কাজ জানা হয়।

বানানা জানো ?

আমি বললাম, জানি বস।

মোবারক উদ্দিন বললেন, মিজান কই ? এদিকে আস, এই ছেলে বানান জানে কি-না দেখ।

মিজান কাছে এসে দাঁড়ালেন। প্রায় তালগাছের মতো লম্বা একজন মানুষ। চেহারায় বিড়াল ভাব আছে। দেখে মনে হয় আল্লাহ তাঁকে বিড়াল বানাতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে মত পাল্টে লম্বা মানুষ বানিয়েছে। ভদ্রলোকের মুখভর্তি দাঁত। দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। দেখেই মনে হয় তার দাঁত ধারালো। মিজান বললেন, 'কি' এবং 'কী' এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ কী ?

আমি বললাম, স্যার জানি না।

তিনি মনে হলো আমার উত্তর শুনে খুশি হলেন। তিনি আনন্দের হাসি হেসে বললেন, দুটাই প্রশ্নবোধক। যে 'কি'র উত্তর মাথা নেড়ে দেয়া যায় সেটা হ্রস্বই কারে 'কি'। যেমন ভাত খেয়েছ কি ?

আবার যার উত্তরে কিছু বলতে হয় মাথা নেড়ে কাজ হয় না সেটা দীর্ঘইকারে 'কী'। যেমন তোমার নাম কী ? এই প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়লে হবে না। নাম বলতে হবে। কাজেই দীর্ঘইকার।

মোবারক উদ্দিন ধমক দিয়ে বললেন, মিজান!

বাংলার প্রফেসরি বন্ধ করো। তুমি প্রফেসর না।

ইন্টার ফেল পাবলিক। এই ছেলে পারবে কি পারবে না— সেটা বলো।

মিজান বললেন, ডিকশনারি দেখতে পারলে পারবে। শিখায়া পড়ায়া নিতে পারব। ডিকশনারি দেখতে না পারলে হবে না।

মোবারক উদ্দিন বললেন, ডিকশনারি দেখতে পারবে না এটা তুমি কী বললা বিলাইয়ের মতো। তোমার চেহারা যেমন বিলাইয়ের মতো, বুদ্ধি-শুদ্ধি বিলাইয়ের মতো। এই ছেলে মেট্রিকে রাজশাহী বোর্ডে থার্ড হয়েছে। ইন্টারে হয়েছে সাত নম্বর।

স্যার! গল্পের মধ্যে একটু মিথ্যা বলে ফেলেছি। আপনার কাছে ক্ষমা চাই। মোবারক উদ্দিন আমার এসএসসি এইচএসসি রেজাল্ট নিয়ে কিছু বলেন নাই। এটা আমি বানায়ে বলেছি।

আমি যে পড়াশোনায় ভালো এটা যেন আপনি জানেন সেই কারণে বলেছি। আপনার কাছে ক্ষমা চাই। মোবারক উদ্দিন যেটা বললেন সেটা হলো— তোমার চেহারা যেমন বিলাইয়ের মতো কথাবার্তাও বিলাইয়ের মতো। পরীক্ষা নিয়া দেখ ডিকশনারি দেখতে পারে কি-না।

আমি ডিকশনারি দেখা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। ঠিক হলো সেকেন্ড প্রুফ দেখব। ফার্স্ট প্রুফ এবং লাস্ট প্রুফ দেখবেন মিজান। ফর্মা প্রতি পাব কুড়ি টাকা। এখান থেকে আমার খাবারের খরচ কেটে বাকিটা দিয়ে দেয়া হবে। অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত থাকব মিশন প্রেসে।

মিজান সাহেব আমার দেখা প্রথম লেখক। তিনি সব ধরনের বই লেখেন। তার লেখা 'ছোটদের ক্রিকেট' যেমন আছে তেমনি আছে 'ছোটদের বিশ্বকাপ ফুটবল'।

তিনি কয়েকটা সেক্সের বইও লিখেছেন। এই বইগুলো সবচে' চালু। নিউজ প্রিন্টে দশ হাজার এডিশন ছাপা হয়। এজেন্টের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তার গদ্য ভালো। বানান নির্ভুল। তার লেখা 'নষ্টা মেয়ের মধ্যরাতের নষ্টামী ও দুষ্টামী' বইটির প্রথম কয়েক লাইন পড়লেই আপনি বুঝবেন। বইটা আমার সঙ্গে আছে। স্যার পড়ে শোনাই। কিছু যদি মনে না করেন।

তার নাম কমলা। গাত্রবর্ণ কমলার মতো। মুখমণ্ডল কমলার মতো গোলাকার। বক্ষদেশও কমলার মতোই সুডৌল এবং গোলাকার। তবে বক্ষদেশের কর্ণ কমলার মতো না। ঈষৎ গোলাপি। সে নিয়মিত স্তন যুগল গোলাপজলে ধৌত করে বলে সেখানে গোলাপের সুবাস পাওয়া যায়।

স্যার, আপনার কাছে অনেক ফাউল কথা বলে ফেলেছি। নিজগুণে ক্ষমা করবেন। মিজান সাহেবের কথা বলি, ওনার বয়স চল্লিশ। তিনি চিরকুমার। অতি ভদ্র এবং বিনয়ী। প্রেসের সবাই তাকে ডাকে ম্যাও মামা।

তিনি রাগ করেন না। আমি তাকে মিজান মামা বলে ডাকা শুরু করেছিলাম। তিনি বললেন, আমাকে ভাইয়া ডাকবে। মামা বা আংকেল ডাকার মতো বয়স আমার হয় নাই। আমার ক্রমিক আমাশা আছে। এই কারণে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে বলে বয়স বেশি মনে হয়।

আমার থাকার ব্যবস্থা হলো মিজান ভাইয়ার ঘরে। এই ঘরে ফ্যান আছে। তিনি ফ্যান ছাড়েন না, কারণ ফ্যানের বাতাসে তাঁর ঠাণ্ডা লাগে। বুকে কফ বসে যায়। ঘরে একটা জানালা আছে, সেই জানালা তিনি খুলেন না, কারণ জানালা দক্ষিণমুখী। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। এই হাওয়াতেও তাঁর সমস্যা। সারারাত তিনি বিরামহীন কাশেন। এই কাশি দিনে থাকে না। রাতে ঘুমাতে যাবার পর থেকে তিনি কাশতে শুরু করেন। গল্পের প্রায় সবটাই বাংলা বানান বিষয়ে।

'বাংলা একাডেমী এক ধরনের বানান শুরু করেছে। নতুন বানানরীতি। এই রীতিতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের অনেক বানান ভুল। আফসোসের কথা কিনা তুমি বলো।'

উনি যা বলেন আমি তাতেই সায় দেই। আশ্রিত মানুষের সাধারণ প্রবণতা থেকে এই কাজটা করে। তাদের মাথায় থাকে সবাইকে খুশি রাখতে হবে।

স্যার, আপনার কি মনে হচ্ছে আমি জ্ঞানীর মতো কথা বলা শুরু করেছি ? আমার মনে হয় হচ্ছে, কারণ আপনি ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। স্যার যদি অপরাধ না নেন তাহলে বলি। আমি কিন্তু ভালো পড়াশোনা করা ছেলে। আমাদের এলাকায় বিশাল বড় একটা পাঠাগার আছে। নাম 'অশ্বিনী বাবু সাধারণ পাঠাগার'। অশ্বিনী বাবুর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই দিয়ে পাঠাগার। বাংলাদেশের যেকোনো বড় পাবলিক লাইব্রেরির চেয়েও সেই পাঠাগারের বইয়ের সংখ্যা বেশি।

অশ্বিনী বাবু এক রাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে ইন্ডিয়া চলে যান। তাঁর বাড়িঘর নিয়ে নানান ক্যাঁচাল শুরু হয়। তাঁর বই দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরি করা হয়। বিএনপি আমলে সেই লাইব্রেরির নাম হয় 'শহীদ জিয়া পাবলিক লাইব্রেরি'। আওয়ামী লীগ আমলে নাম বদলে হয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাঠাগার'। আমার কাছে সবসময় অশ্বিনী বাবু পাঠাগার। আমি এক বছর এই পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম। আমার মাসিক বেতন ছিল একশ' ত্রিশ টাকা। এই টাকাটা আমাকে নিজের পকেট থেকে দিতেন পৌরসভার চেয়ারম্যান জলিল সাহেব।

অশ্বিনী বাবুর পাঠাগারে কোনো গল্প উপন্যাসের বই ছিল না। একটু ভুল বললাম, চারটা গ্রন্থাবলি ছিল (রবীন্দ্রনাথ, মানিক, বিভূতি এবং তারাশঙ্কর)। বাকি সব বই এককথায় জ্ঞানের বই। ইতিহাস, দর্শন, তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান। প্রথমে বইপড়া শুরু করেছিলাম সময় কাটানোর জন্যে, শেষে নেশার মতো হয়ে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত বই না পড়ে ঘুমাতে পারতাম না। গোগ্রাসে ভাত খাওয়ার কথা জানি, তখন জানলাম গোগ্রাসে বইপড়া। আমার বইপড়া অভ্যাসটা একসময় খুব কাজে এলো।

কীভাবে সেটা বলি।

স্যার, আপনি মূল গল্পে আসতে বলেছেন। এই কথাগুলো না বলে মূল গল্পে আসা যাবে না। একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।

স্যার প্লিজ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওরোটিক্যাল ফিজিক্সের একজন অধ্যাপক, ধরা যাক তাঁর নাম প্রফেসর মোহিত হাওলাদার (নকল নাম দিলাম, আসল নাম দিতে চাচ্ছি না।) তাঁর একটা বই ছাপা হচ্ছিল আমাদের মিশন প্রেসে। বইয়ের নাম— 'কোয়ান্টাম জগৎ'। বইয়ের ফাইনাল প্রুফ আমি স্যারের ফুলার রোডের বাসায় নিয়ে যাই। প্রুফ ভেতরে পাঠিয়ে আমি স্যারের বসার ঘরের সোফার এক কোণায় বসে থাকি। স্যার আগের প্রুফ ফেরত পাঠান।

কোনো কোনো দিন সঙ্গে সঙ্গেই প্রুফ পাই। আবার কখনো দুই তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। একদিনের কথা— আমি অনেকক্ষণ বসে আছি। সকালবেলা গেছি, দুপুর হয়ে গেছে। স্যার আগের প্রুফ দিচ্ছেন না। আমি চলে যাব নাকি আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব তাও বলছেন না। অন্যদিন এত দেরি হলে চা বিস্কিট আসে, আজ তাও আসছে না। এক সময় স্যার বসার ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, তুমি ?

তুমি কখন এসেছ ?

সকাল আটটায় এসেছি স্যার।

স্যার বললেন, আশ্চর্য কথা। একটা ত্রিশ বাজে, আমাকে তো কেউ বলেনি তুমি এসেছ। সরি এক্সট্রিমলি সরি। তোমার নাম কী ?

আমি নাম বললাম। স্যার আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, প্রুফ কে দেখে ?

আমি বললাম, ফার্স্ট প্রুফ দেখেন আমাদের একজন প্রুফ রিডার। ওনার নাম মিজান। আমি সেকেন্ড প্রুফ দেখি।

তোমাদের প্রুফ রিডিং খুবই ভালো। প্রায় নির্ভুল। চা খাবে ?

আমি বললাম, জি না স্যার।

দশটা মিনিট বসো, আমি প্রুফ এবং প্রিন্ট অর্ডার একসঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।

স্যার দশ মিনিটের কথা বলে প্রায় আধঘণ্টা পরে প্রুফ হাতে বসার ঘরে ঢুকে বললেন, এসো খেতে আস। এতবেলা না খেয়ে যাবে কেন ? অস্বস্তিবোধ করার কোনো কারণ নেই। বাথরুম ঐদিকে। হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে খেতে বসো। আমিও তোমার সঙ্গে খাব। আমি একা থাকি, তুমি জানো তো ?

জানি স্যার।

ব্যাচেলর বাড়ির খাওয়া ভালো কিছু থাকবে না। One item food. এটাই আমার পছন্দ। আমার ফিলোসফি—আমরা খাই বেঁচে থাকার জন্যে। সুখাদ্য খাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকি না।

খাওয়ার টেবিলে দু'জন বসলাম। সত্যি সত্যি এক আইটেম খাওয়ার। খিচুড়ি জাতীয় বস্তু। প্রচুর সবজি দেয়া। মাংসও আছে।

স্যার বললেন, ক্যালোরি হিসাব করে রান্না। পুরো এক প্লেট খিচুড়িতে ক্যালোরি হবে দু'হাজার। চামচ দিয়ে যদি খাও তাহলে প্রতি চামচে সত্তর থেকে আশি ক্যালোরি।

খাওয়ার এক পর্যায়ে হঠাৎ আমি স্যারকে একটা প্রশ্ন করে বসলাম। তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন 'ইলেকট্রন ঘুরছে আমরা বলে থাকি। ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের অবস্থানটা কী ? অবস্থান অজানা। অবস্থান তখনি জানা যাবে যখন একজন অবজারভার বা একজন পরিদর্শক ইলেকট্রন কোথায় আছে জানার চেষ্টা করবেন। তার আগে না। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগৎ পরিদর্শক বা অবজারভার নির্ভর জগৎ।'

আমি খুব ভয়ে ভয়ে স্যারকে বললাম, স্যার আপনি যে বইয়ে লিখেছেন 'কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগৎ অবজারভার নির্ভর। যেহেতু আমরা প্রতিটি ইলেকট্রন অবজারভ করছি না সেহেতু এই জগৎ অস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণই ধোঁয়াটে।'

স্যার সামান্য বিস্মিত হয়ে বললেন, তা অবশ্যি বলেছি। তাঁর বিস্ময়ের কারণটা স্পষ্ট। তিনি আশা করেননি একজন প্রুফ রিডার তার লেখা বইয়ের অংশ মুখস্থ বলবে।

আমি বললাম, স্যার একজন Observer তো আছে যে Observer প্রতিটি ইলেকট্রন প্রোটন দেখছে। কাজেই সেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগৎও নির্দিষ্ট। অস্পষ্ট না।

স্যার বললেন, সেই অবজারভারটা কে ?

আমি বললাম, স্যার আল্লাহ্‌পাক।

তোমার পড়াশোনা কী ?

আমি বললাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব বলে এসেছি।

কেমিস্ট্রি পড়ার ইচ্ছা।

রেজাল্ট কী ?

আমি রেজাল্ট বললাম।

স্যার বললেন, কেমিস্ট্রি ছাতামাতা পড়ে লাভ নেই। মূল বিজ্ঞান হলো পদার্থবিদ্যা। সৃষ্টির রহস্য জানতে হলে পদার্থবিদ্যা পড়তে হবে। তুমি পড়বে ফিজিক্স।

আমি তখন সামান্য সাহস পেয়েছি। আমি বললাম, সৃষ্টির রহস্য তো স্যার কোনো দিনই জানা যাবে না।

কেন জানা যাবে না ?

আমি বললাম, স্যার আমরা তো সৃষ্টির একটা অংশ। সৃষ্টির অংশ হয়ে সৃষ্টিকে কীভাবে জানব ? সৃষ্টিকে জানতে হলে তার বাইরে যেতে হবে। সেটা কি স্যার সম্ভব ?

না, সম্ভব না।

আমি বললাম Big Bang থেকে সৃষ্টি শুরু। সৃষ্টিকে জানতে হলে আমাদের Big Bang-এর আগে যেতে হবে। স্যার, এটা কি সম্ভব?

স্যার বললেন, বিজ্ঞান নিয়ে তুমি কি পড়াশোনা করো?

হাতের কাছে বইপত্র যা পেয়েছি পড়েছি। সবই Popular Science.

যেসব বই পড়েছ তার একটা নাম বলো।

আমি বললাম, The hole in the universe. অথরের নাম K. C. Cole.

আমার কাছে প্রচুর বই আছে। Popular Science না Real Science. তুমি যেকোনো বই আমার লাইব্রেরি থেকে নিতে পারো। খাতায় নাম লিখে বই নেবে। যখন ফেরত দেবে নাম কেটে দেবে।

জি স্যার।

আজ থেকেই শুরু হোক। নিয়ে যাও কিছু বই।

স্যারের বাসা থেকে চারটা বই নিয়ে এলাম। এর মধ্যে একটা উপন্যাস।

উপন্যাসের নাম The curious incident of the dog in the night time.

বইটার লেখকের নাম Mark Haddon.

স্যার, এখন আমি মূল গল্পে ঢুকব।

আমার বস মোবারক উদ্দিন সাহেব আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। থাকার ব্যবস্থা হলো তাঁর গুদাম ঘরে। পুরনো ঢাকায় যেমন বহুদিনের পুরনো দালানকোঠা থাকে সেরকমই একটা দালান। মিউনিসিপ্যালিটি পাঁচ বছর আগে বিল্ডিংটাকে Condemed ঘোষণা করে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। আমার বস টাকা খাইয়ে সেটা বন্ধ রেখেছেন। বাড়িটার নাম 'আশা কুটির'। বাড়ির শ্বেতপাথরের মেঝে থেকে বোঝা যায় একসময় এর অনেক শান-শওকত ছিল। তখন পুরোদস্তুর জঙ্গলখানা। একতলায় প্রেসের ম্যাটার, পুরনো বইয়ের গাদা। একটা ভাঙা ট্রেডল মেশিন। সিসার টাইপ। দুই সেট উইয়ে খাওয়া সোফা। দোতলার চারটা ঘরের দু'টার দরজা-জানালা কিছুই নেই। একটা অংশের দেয়াল ভেঙে পড়েছে। দুটো অক্ষত ঘরের পুরোটা পুরনো আমলের ফার্নিচারে ঠাসা। বড় একটা আলমারি আছে। সেই আলমারি তালাবদ্ধ। তালায় জং পড়েছে। গত দশ বছরে এই আলমারি কেউ

খুলেনি তা বোঝা যাচ্ছে। আমাকে ঘর দু'টার যেকোনো একটায় থাকতে বলা হলো। আমার প্রতি দয়া দেখিয়ে যে কাজটা করা হলো তা-না। পাহারাদারের কাজ পেলাম। একজন দারোয়ান সারা রাত বাইরে ডিউটি দেবে। আমি থাকব ভেতরে। ডবল সুরক্ষা।

ফার্নিচার সরিয়ে একটা ঘরের কোণায় চৌকি পাতলাম। ঘরটায় জানালা নেই। তিনটা জানালাই পেরেক মেরে পুরোপুরি বন্ধ। দরজা খোলা রাখলে সামান্য আলো আসে। দরজা বন্ধ করলেই কবরের অন্ধকার।

দারোয়ানের সঙ্গে আলাপ করলাম। একটা জানালা খোলা যায় কি-না। দারোয়ান বলল, কেন যাবে না! বসকে বলে মিস্ত্রি ডাকিয়ে খুলে দিলেই হয়।

বস কি রাজি হবেন?

অবশ্যই রাজি হবেন। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকতে হবে। দোতলায় ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে গেছে। তার ঠিক করতে হবে। একটা ফ্যান লাগবে। ফ্যান ছাড়া ঘুমাতে পারবেন না।

আমি বললাম, ফ্যান পাব কই?

দারোয়ান বলল, ফ্যানের অসুবিধা নাই। একতলায় মালখানায় কয়েকটা ফ্যান আছে।

দারোয়ানের নাম ছামছু। আমি তাকে ডাকি সামসু, বয়স চল্লিশের মতো। তার তিনটা রিকশা আছে, ভাড়ায় খাটে। রাত বারোটায় রিকশাওয়ালা রিকশা জমা দিয়ে যায়। তখন সামসু গুদামঘর পাহারা বাদ দিয়ে নিজেই রিকশা নিয়ে বের হয়। রাত বারোটার পর রিকশা ভাড়া হয় দু'গুণ তিনগুণ। অল্প পরিশ্রমে ভালো পয়সা।

সামসু বলল, আপনি বসকে আমার রিকশা নিয়ে ট্রিপে যাওয়ার কথা বলবেন না। আমিও আপনার বিষয় কিছু বলব না।

আমি বললাম, আমার কী বিষয়?

সামসু নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আপনি যুবক ছেলে। যুবক ছেলের কত বিষয়ই থাকতে পারে। ধরেন ঘরে মেয়ে মানুষ নিয়া আসলেন।

প্রথম বারের মতো রাতে গুদামঘরে থাকতে গেলাম। মিস্ত্রি ডাকা হয়নি। ইলেকট্রিসিটির কানেকশন নাই। হারিকেন জ্বালিয়েছি। দরজা বন্ধ করতেই ভাদ্রমাসের তালপাকা গরমে তুঙ্গে গেলাম। বড় ভুল যেটা করেছি তালপাতার হাতপাখা কেনা হয়নি। খাবার পানির ব্যবস্থা করেছি। এক জগ পানি রেখেছি টেবিলের ওপর। টেবিলটা সাধারণ না। ময়ূর আঁকা আধা পুরনো আমলের গাবদা ড্রেসিং টেবিল। বড় আয়না আছে। আয়নার মাঝামাঝি বড় ধরনের

ভাঙা হারিকেনটাও ঐ টেবিলে রাখা। হারিকেনের আলোয় বই পড়ে রাত কাটানো ছাড়া অন্য উপায় নেই। মূল দরজাটা খোলা রাখলে কিছু আলো আসত। কিন্তু বস বলে দিয়েছেন—ডাবল সিটকিনি দিয়ে দরজা লাগাতে। ঘরে অনেক দামি দামি পুরনো আমলের জিনিস আছে।

আমি বই পড়তে শুরু করেছি। The curious incident নামের বইটা পড়তে শুরু করেছি। অদ্ভুত বই। ফার্স্ট চ্যাপ্টার নেই, শুরু হয়েছে সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে। প্রথম লাইন—

It was seven minutes after midnight.

আমি নিজের ঘড়ি দেখলাম। কী আশ্চর্য, আমার ঘড়িতেও বারোটা সাত। কাকতালীয় ব্যাপার তো বটেই। মাঝে মাঝে কাকতালীয় ব্যাপারগুলো এমন হয় যে বুকে ধাক্কার মতো লাগে।

অল্প সময়ের ভেতরেই বইয়ের ভেতরে ঢুকে গেলাম। পানির তৃষ্ণা পেয়েছে অথচ পানি খাবার জন্য বই পড়া বন্ধ রেখে যে টেবিলের কাছে যাব সেই ইচ্ছাও হচ্ছে না। গরমে আমার গা দিয়ে ঘাম পড়ছে। ঘামে বিছানার চাদর ভিজে গেছে— আমার লক্ষই নেই। প্রবল তৃষ্ণার কারণে আমি এক সময়ে বই বন্ধ করে টেবিলের দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণের জন্য আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে অল্পবয়সী এক মেয়ে। সে গভীর আগ্রহে নিজেকে দেখছে। আমি এরকম সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে কখনো দেখিনি। মেয়েটার গায়ে ঘাগরা জাতীয় পোশাক। পোশাকের রঙ হালকা কমলা। সেখানে ছোট ছোট আয়না বসানো। হারিকেনের আলো সেই আলোয় পড়ে চারদিকে প্রতিফলিত হচ্ছে। ঘরময় ছোট ছোট আলোর বিন্দু। মেয়েটির চুল বেণি করা। বেণিতে কমলা রঙের ফিতা। তার মুখ লম্বাটে। নাক খানিকটা চাপা। নাকে নাকফুল আছে। সেই নাকফুলও হারিকেনের আলোয় ঝলমল করছে। নিশ্চয়ই দামি কোনো পাথরের নাকফুল। কমদামি পাথর এভাবে আলো ছড়ায় না।

আমি 'কে কে' বলে চিৎকার করে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলালাম। কারণ ততক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে এটা একটা স্বপ্নদৃশ্য। বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি, স্বপ্ন দেখছি। চিৎকার চেঁচামেচি না করে স্বপ্নটা ভালোমতো দেখা যাক।

স্যার! আমি যা দেখছি তা যে সত্যিই দেখছি স্বপ্নও দেখছি না তা তখন বুঝিনি। স্বপ্ন সাদাকালো হয় এবং স্বপ্ন হয় গন্ধবিহীন। আমি সব রঙিন দেখছি এবং মেয়েটার গা থেকে আতর কিংবা সেন্টের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি।

আয়নার উপর দিয়ে একসময় একটা টিকটিকি দৌড়ে গেল। মেয়েটা সামান্য চমকালো। এ ধরনের ডিটেলও স্বপ্নে থাকে না। স্বপ্নে যদি কেউ টিকটিকি দেখে তখন সেই টিকটিকি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে আসে।

মেয়েটা আয়নায় নিজেকে দেখা শেষ করে ঘুরল। এখন সে অবশ্যি আমাকে দেখছে। তার চোখ ভাবলেশহীন। যেন সে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

আমি বললাম, তুমি কে, ঘরে ঢুকলে কীভাবে?

আমি মেয়েটিকে ভয় পাচ্ছি না। কারণ আমি জানি— স্বপ্ন দেখছি। অতি রূপবতী একটা মেয়েকে স্বপ্নে দেখে কেউ ভয় পায় না। ভূত, প্রেত, সাপ, বাঘ, সিংহ দেখতে ভয় পায়।

মেয়েটা কী কারণে যেন নড়ল। ঝনঝন শব্দ হলো। আমি দেখলাম তার হাতে একগোছা চাবি। সে আবার আয়নার দিকে তাকাল। হাসির মতো ভাব করে টেবিলের উপর রাখা ফিজিক্সের বইটা হাতে নিয়ে কয়েকটা পাতা উল্টাল। সে বইটা রেখে দিল। তবে ঠিক আগে যেখানে ছিল সেখানে রাখল না—একটু সরিয়ে রাখল এবং উল্টো করে রাখল। এখন সে এগিয়ে যাচ্ছে তালাবদ্ধ আলমারির দিকে। আমি তাকিয়ে আছি। ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত সে চাবির গোছা দিয়ে আলমারির তালা খোলার চেষ্টা চালাতেই লাগল।

এক সময় মসজিদে আজান হলো। মেয়েটাকে আর দেখা গেল না।

সারারাত জেগেছিলাম। ভোরবেলা ঘুমিয়ে পড়লাম। ভালো ঘুম হলো না। আজেবাজে সব স্বপ্ন। বল্লম হাতে কিছু মানুষজন ছুটে আসছে। তাদের সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চা। তাদের হাতে তীর ধনু। আমি প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি। বাচ্চাগুলো বিচ্ছু প্রকৃতির। এদের গতি বাতাসের মতো। আমাকে প্রায় ধরে ফেলে এমন অবস্থা। এরা তীর ছুঁড়ছে। কিছু কিছু গায়ে লাগছে। যেখানে লাগছে সেখানে চিড়বিড় জ্বলুনি। এদের একটা তীর ঘাড়ে লাগল। প্রচণ্ড জ্বলুনিতে ঘুম ভাঙল। জেগে দেখি, বিছানা ভর্তি বড় বড় লাল পিঁপড়া। এরাই আমাকে কামড়াচ্ছিল। আমার মস্তিষ্ক সেই কামড়ানোকে বাচ্চাদের ছোড়া তীর হিসেবে আমাকে দেখিয়েছে।

মানুষের ব্রেইন খুব অদ্ভুত। সে বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা নিজের মতো করে দেখে। ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে হলো, আমার ক্ষেত্রেও কি এরকম কিছু ঘটেছে? আমার ব্রেইন একটি তরুণী মেয়ে তৈরি করে আমাকে দেখাচ্ছে।

সারাদিন ঘর থেকে বের হলাম না। সামসুকে দিয়ে পরোটা-ভাজি এনে খেলাম। ইংরেজি উপন্যাসটা পড়ে শেষ করলাম। দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে

Doridro.com

জেগে উঠলাম সন্ধ্যাবেলা। সামসুই জেগে উঠাল। চিন্তিত মুখে বলল, সারাদিন ঘুমাইছেন। ঘর থাইকা বাইর হন নাই— শরীর খারাপ ?

আমি বললাম, শরীর খারাপ না। রাতে ঘুম হয় নাই এটাই সমস্যা।

সামসু বলল, যে গরম ঘুমাইবেন ক্যামনে? তয় সমস্যা নাই, ইলেকট্রিশিয়ান আনছি। লাইন ঠিক করতেছে। লাইন ঠিক কইরা ফ্যান লাগায়ে দিবে। এক ঘণ্টার মামলা। আমি ইতস্তত করে বললাম, সামসু এই বাড়িতে ভূত-প্রেত আছে না-কি ?

সামসু বলল, ঢাকা শহরেই কোনো ভূত নাই। মানুষ থাকার জায়গা নাই ভূত থাকব ক্যামনে? তবে গ্রামগঞ্জে দুই একটা থাকলে থাকতেও পারে।

মিশন প্রেসে একবার যাওয়া দরকার ছিল। সেখানে সারাদিন যা কম্পোজ হয়, সন্ধ্যার পর তার প্রুফ দেখা হয়। মিশন প্রেসে যেতে ইচ্ছা করল না। হোটেলে রাতের খাওয়া সারলাম। সস্তার তেহারি এক প্লেট দই। দইটা খেলাম শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য। শরীর কোনো কারণে গরম হলে মানুষ আজেবাজে স্বপ্ন দেখে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে ফিরে আমি অবাক। একশ' পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। ঘরে দিনের মতো আলো। বিছানার উপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে। ঘরে বাতাসের বন্যা। সামসু বলল, কাইল রাইতে ঘুমাইতে পারেন নাই, আইজ নাক ডাকায়া ঘুমাইবেন।

আমি বললাম, ফ্যান থেকে তো জাহাজের মেশিন ঘরের মতো শব্দ আসছে।

সামসু বলল, আসুক। শব্দ কোনো বিষয় না। গরমটা বিষয়।

আমি বিছানায় শুয়ে বই নিয়ে পড়তে বসেছি। Hole in the Universe. নামটা যত সুন্দর বই তত সুন্দর না। লেখক কারণ ছাড়াই রহস্য করছেন। কথায় কথায় বাইবেল টেনে আনছেন। জটিল বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ধর্ম মিশিয়ে যে বস্তু তৈরি হচ্ছে তার নাম জগাখিচুড়ি।

ভালো কথা স্যার, জগাখিচুড়ি শব্দটা কোত্থেকে এসেছে জানেন ? পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ভক্তদের দেয়া চাল-ডাল মিশিয়ে এক ধরনের খিচুড়ি তৈরি হতো। তার নাম জগন্নাথের খিচুড়ি। সেখান থেকে এসেছে জগাখিচুড়ি।

যে গল্পটা আপনাকে বলছি তার সঙ্গে জগাখিচুড়ি নামের ব্যাখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু বললাম যাতে আপনার বিশ্বাস হয় আমি পড়াশোনা করা ছেলে। গ্রামের কলেজ থেকে আসা হাবাগোবা ভালো ছাত্র না।

মূল গল্পে ফিরে যাই—আমি বই পড়ছি কিন্তু বইয়ে মন দিতে পারছি না। গত রাতে দেখা মেয়েটা কি আজো আসবে। তার গায়ে কি ঐদিনের পোশাক থাকবে ? গত রাতে সে যা করেছে আজো কি তাই করবে। আলমারির তালা খোলার চেষ্টা করবে ? বেশির ভাগ ভূতের গল্পে দেখা যায় ভূত-প্রেত রাতের পর রাত একই কাণ্ড করে। যে ভূতকে দেখা যায় সিলিং ফ্যান থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, তাকে সেই অবস্থাতেই সবসময় দেখা যায়।

রাত বারোটা পর্যন্ত বই পড়লাম, মেয়েটা এলো না। ঘরে একশ' ওয়াটের বাতি জ্বলছে, এই কারণে কি আসতে পারছে না ? আমি বাতি নিভিয়ে দিলাম। অন্ধকার ঘরে টেবিলের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করলাম। মেয়েটার দেখা নেই। তখন মনে হলো, ঘরটা কবরের মতো অন্ধকার। এই অন্ধকারে মেয়েটাকে দেখব কীভাবে? হারিকেন জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রেখে অপেক্ষা শুরু করলাম।

অপেক্ষার নিজস্ব ক্লান্তি আছে। সেই ক্লান্তিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল গুনগুন শব্দে। কে যেন গান করছে। চমকে তাকিয়ে দেখি মেয়েটা এসেছে। তাকিয়ে আছে আয়নার দিকে। গুনগুন শব্দে এবং নিজের সুরেই সামান্য দুলছে।

স্যার, এখন একটা কথা বলব বেয়াদবি নিবেন না। আমি বয়সে আপনার ছেলের চেয়েও ছোট হব।

বাপের বয়সী একজন মানুষের সঙ্গে এ ধরনের কথা বলা যায় না। কিন্তু আমি ঠিক করেছি কিছুই গোপন করব না। যা দেখেছি সবই আপনাকে বলব।

মেয়েটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়। কী সুন্দর যে তাকে দেখাচ্ছিল! লজ্জায় তাকাতে পারছিলাম না আবার চোখও ফিরিয়ে নিতে পারছিলাম না। তার গায়ের পোশাকটা টেবিলের উপর রাখা। সে একসময় পোশাকটা পরল। গত রাতে ওড়না ছিল না। আজ দেখি ওড়না আছে। লাল রঙের ওড়না। ওড়নাটা সে মাথায় দিয়েছে। লাল ওড়নার ভেতর একটা মুখ। বড় বড় চোখ। গোলাপি ঠোঁট। আমি বললাম, এই মেয়ে তুমি কে ? তোমার নাম কী ?

মেয়েটার কোনো ভাবান্তর হলো না। সে চাবির গোছা হাতে এগিয়ে গেল আলমারির দিকে। গত রাতের মতো তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। আমি বিছানা থেকে নামলাম। হারিকেনটা হাতে নিলাম। তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে কিছুই বুঝল না। আমি বললাম, আলমারিতে কী আছে ? তুমি কী খোঁজ ? মেয়েটা নির্বিকার। তার ভুবনে আমার কোনো

অস্তিত্ব নাই। হারিকেনের তেল শেষ হয়ে গিয়েছিল। দপ করে নিভে গেল। ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত আমি বিছানায় বসে রইলাম।

এত বড় একটা ঘটনা—কাউকে তো বলতে হবে। মিজান ভাইকে বললাম। তিনি আগ্রহ নিয়ে শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন।

মিজান ভাই বললেন, জুয়ান বয়সে সুন্দরী নেংটা মেয়ে দেখা স্বাভাবিক ব্যাপার। এই বয়সে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সেক্স হচ্ছে এমন স্বপ্ন দেখে। তখন স্বপ্নদোষ হয়। আমার একটা বই আছে, নাম— 'স্বপ্নের কাম কাহিনী'। বইটাতে স্বপ্নের সেক্স বিস্তারিতভাবে লিখেছি। পড়লেই সব বুঝবে।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

মিজান ভাই বললেন, শরীর খুব বেশি চড়ে গেলে আমাকে বলবে আমি ব্যবস্থা নিব।

কী ব্যবস্থা নিবেন ?

শরীর ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করব। তোমাকে প্রেস কোয়ার্টারে নিয়ে যাব। পনের দিনে একবার গেলেই শরীর দিঘির পানির মতো ঠাণ্ডা থাকবে। ভালো কিছু অল্পবয়েসী মেয়ে আছে আমার পরিচিত। ওদের বলে দেব। টাকা-পয়সা যাতে নামমাত্র লাগে সেটা আমি দেখব। তোমাকে অত্যধিক স্নেহ করি বলেই এটা করব।

আমাকে 'অত্যধিক স্নেহ' করা শুরু করলেন প্রফেসর মোহিত হাওলাদার। তার স্নেহ পাওয়ার কারণ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট হয়েছি। যেকোনো সাবজেক্ট পড়তে পারি। আমি নিয়েছি ফিজিক্স।

মোহিত স্যার আমাকে বলেছেন, প্রথম এক বছর তুমি হোস্টেলে সিট পাবে না। এক কাজ করো, আমার বাড়িতে এসে ওঠ। গেস্ট রুমটা নিজের মতো গুছিয়ে নাও। খাবে আমার এখানে, আমি যা খাই তাই খাবে।

স্যারের গেস্ট রুমটা চমৎকার। সেখানে শুধু ফ্যান না, এসি পর্যন্ত আছে। আমি স্যারের সঙ্গে থাকতে এলাম না। কারণটা খুব পরিষ্কার। আমার পক্ষে গুদামঘর ছেড়ে আসা মানে মেয়েটাকে ছেড়ে আসা। সেটা সম্ভব না। আমি মেয়েটার একটা নাম দিয়েছি—'আয়না'। সে আয়নায় অনেকক্ষণ নিজেকে দেখে বলেই তার নাম আয়না। যতক্ষণ আয়না থাকে ততক্ষণই আমি নিজের মনে বকবক করি। আয়না আমার কথা শুনতে পায় না। তাতে কী আছে ?

আয়নাকে দেখামাত্র আমি বলি—'আয়না কী খবর ? আজ আসতে দেরি করছ কেন ? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বুঝতে পারছ? বৃষ্টিতে ভিজবে? চলো ভিজে আসি। তবে একটা কথা, তোমাকে নেংটো অবস্থায় আমি ছাদে নেব না। কাপড়টা গায়ে দাও তারপর নিয়ে যাব। আলমারি খোলার জন্যে এত চেষ্টা করতে হবে না। আমি একটা চাবিওয়ালা এনে আলমারি খোলার ব্যবস্থা করব। পরেরবার যখন আসবে দেখবে আলমারি খোলা। ঠিক আছে ? খুশি ?'

তালা খোলার লোক আমি ঠিকই নিয়ে এসেছিলাম। হঠাৎ মনে হলো তালা খুললে মেয়েটা যদি আর না আসে ? সে এখানে আসে তো শুধু তালা খোলার আগ্রহে। তালাওয়াকে ফেরত পাঠালাম।

স্যার, আমি মেয়েটার সঙ্গে অনেক রহস্যও করি।

একদিন কী করলাম শুনুন। আয়নাটা কালো কাগজ দিয়ে স্কচটেপ মেরে ঢেকে দিলাম। সেদিন বেচারি খুবই অবাক হলো। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। যেন কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। তখন আমি নিজেই উঠে টেনে কালো কাগজটা খুললাম। বেচারি শান্ত হলো।

আরেকদিন কী করেছি শুনুন। তার জন্যে একটা শাড়ি কিনে এনে টেবিলে রেখে দিয়েছি। সে অবাক হয়ে শাড়িটা হাতে নিয়ে দেখেছে। এদিক-ওদিক দেখেছে। ভাবটা এরকম যে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

একবার এক সেন্টের একটি শিশি রাখলাম। সে গন্ধ শুঁকল, এদিক-ওদিক তাকাল। তার মধ্যে হতভম্ব ভাব লক্ষ করলাম।

সারারাত আমি জেগে থাকি— ঘুমাতে যাই ভোরবেলায়। ঘুমের মধ্যে মেয়েটাকে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে তার সঙ্গে অনেক কথা হয়। স্বপ্নে তার গলার স্বর থাকে কিশোরী মেয়েদের মতো। স্বপ্নে সে আমাকে গান শোনায়, নাচ দেখায়।

আমার শরীর দ্রুত খারাপ করতে লাগল, একদিন বস আমাকে ডেকে পাঠালেন। ধমক দিয়ে বললেন, কী ঘটনা ? কী অসুখ ?

আমি বললাম, স্যার ঘুম হয় না।

ঘুম হয় না এটা আবার কেমন অসুখ ? ডাক্তারের কাছে যাও। ঘুমের ট্যাবলেট দিবে।

আমি বললাম, জি আচ্ছা বস।

ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছ খবর পেয়েছি, ক্লাসে তো যাও না।

ক্লাস শুরু হয় নাই।

টাকা-পয়সা লাগবে। লাগলে প্রেসের ম্যানেজারের কাছ থেকে নাও। পরে শোধ দিও।

আমি প্রেসের ম্যানেজারের কাছ থেকে পাঁচশ' টাকা নিলাম, সেই টাকায় আয়নার জন্যে রুপার একজোড়া কানের দুল কিনলাম।

অবাক কাণ্ড কী জানেন স্যার ? রুপার কানের দুল কিছুক্ষণের জন্যে আয়না পরেছিল। এই দৃশ্য দেখে আনন্দে আমার চোখে পানি এসেছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার মাথা খারাপ হতে শুরু করেছে। শরীরে বিকার দেখা দিয়েছে। মিজান ভাইয়ের পরামর্শ মতো বিকার কাটাতে আজেবাজে মেয়েদের কাছে যেতে শুরু করেছি। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস শুরু হয়েছে। আমি ক্লাসে যাচ্ছি না। কীভাবে যাব ? সারারাত জেগে থাকি, সারাদিন ঘুমাই।

শরীরের বিকার কাটাতে প্রতি সপ্তাহে একবার মিজান ভাইয়ের সঙ্গে 'প্রেস কোয়ার্টারে' যাই। আমার মোটেও খারাপ লাগে না। যে মেয়েটার কাছে আমি যাই, তার নাম নাসিমা। মেয়েটার বয়স অল্প। চোখে মায়া আছে। আমি আয়নার জন্যে যেসব জিনিস কিনি, আয়নাকে দেখানোর পর সব নাসিমাকে দেই। উপহার পেলে সে খুব খুশি হয়।

একদিন মোহিত স্যার আমার খোঁজে চলে এলেন। তিনি আমাকে দেখে হতভম্ব। তোমার এ কী অবস্থা! কী অসুখ বলো তো।

আমি মিথ্যা করে বললাম, স্যার আমার জণ্ডিস হয়েছে। খারাপ ধরনের জণ্ডিস।

স্যার বললেন, সে তো বুঝতেই পারছি— চোখ হলুদ, হাত-পা হলুদ। তোমাকে ইমিডিয়েটলি হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার। দাঁড়াও অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করি।

আমি বললাম, ব্যবস্থা করতে হবে না স্যার। আমার বাবা কাল ভোরে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন।

স্যার বললেন, তুমি তো আমাকে বলেছিলে বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই।

আমি বললাম, মিথ্যা কথা বলেছিলাম স্যার। বাবা বেঁচে আছেন। তিনি অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করেছেন বলে আমি সবাইকে বলি বাবা মারা গেছেন।

স্যার বললেন, বাবার সঙ্গে চলে গেলে তো চিকিৎসা হবে না। তোমার দরকার প্রপার মেডিকেল কেয়ার।

আমি বললাম, (পুরোটাই মিথ্যা) আমার বাবা একজন ডাক্তার। এমবিবিএস ডাক্তার। খুব ভালো ডাক্তার।

মোহিত স্যার চলে গেলেন। তার লেখা 'কোয়ান্টাম জগৎ' বইটা প্রকাশিত হয়েছে। তার একটা কপি আমাকে দিলেন। বইয়ে লিখলেন—

'দৌলত শাহ্‌কে
আমার দেখা সবচে' মেধাবী একজন।'

বইটার সঙ্গে এক হাজার টাকাও দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকায় আয়নার জন্য রাজশাহী সিল্কের একটা শাড়ি কিনলাম। আমার ধারণা কোনো একদিন আমার দেয়া শাড়ি সে পরবে। আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করবে।

মোহিত স্যার তার বইয়ে প্যারালাল জগতের কথা লিখেছেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে, আমাদের এই জগতের পাশাপাশি ইনফিনিটি প্যারালাল জগৎ আছে। সব জগৎ একসঙ্গে প্রবহমান। একটি জগতের সঙ্গে অন্য জগতের কোনোই যোগাযোগ নেই।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আয়না অন্য কোয়ান্টাম জগতের বাসিন্দা। কোনো এক বিচিত্র কারণে তার জগতের খানিকটা ঢুকে গেছে এই পৃথিবীর জগতে। কিংবা আরো জটিল কিছু। যে জটিলতা ব্যাখ্যা করার সাধ্য এই মুহূর্তে আমাদের নেই। আমাদের কাজ শুধু দেখে যাওয়া। একদিন রহস্যভেদ হবে, তার জন্য অপেক্ষা করা।

স্যার, আপনি লেখক মানুষ। সত্যিকার লেখক হলেন, একজন আদর্শ Ovserver. যিনি দেখেন, কোনো ঘটনা অবিশ্বাস করেন না, আবার বিশ্বাসও করেন না। তিনি অনুসন্ধান করেন absolute truth. স্যার আমি এখন যাব। আয়নার জন্য একজোড়া রূপার নূপুর কিনেছি। হাতে নিয়ে একটু দেখবেন।

সে নূপুর পায়ে দিয়ে হাঁটবে। ঝুমঝুম হাঁটবে। ভাবতেও ভালো লাগছে। আয়না যদি নূপুর পায়ে নাও দেয়, নাফিসা দেবে। সেটাও তো খারাপ না।

স্যার আমি নাফিসার নামও দিয়েছি আয়না। ভালো করেছি না? একজন রিয়েল সংখ্যা— অন্যজন ইমাজিনারি সংখ্যা।

নাফিসা x হলে আয়না $\sqrt{(-1)}\ x$।

শাহ্ মকবুল

গল্প আমি সাধারণত এক বৈঠকে লেখার চেষ্টা করি। গল্প আমার কাছে হচ্ছে একটা রঙিন সুতা দিয়ে নকশা তৈরি করা। নকশা তৈরির কাজ কয়েক বৈঠকে করলে নকশার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। শাহ্ মকবুল গল্প নিয়ে আমি কতবার যে বসেছি তা আল্লাহ মাবুদ জানেন। শেষটায় ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে– গল্পটা ফেলে দিয়েছি।

শাওনের অনেক বিচিত্র স্বভাবের একটি হচ্ছে আমার ফেলে দেয়া গল্প, অসমাপ্ত নাটক যত্ন করে তুলে রাখা। এর জন্যে তার একটা বড় টিনের ট্রাংক আছে। ট্রাংকটা আড়ং থেকে কেনা, লতা পাতা ফুল আঁকা। শাওনের ধারণা আমার ফেলে দেয়া গল্প এবং নাটকগুলো না-কি বেশি ভাল। শাহ্ মকবুলকে উদ্ধার করা হয়েছে শাওনের ট্রাংক থেকে। অসমাপ্ত অংশ শেষ করেছি। কি দাঁড়িয়েছে কে জানে।

স্যার, আমার নাম মকবুল। শাহ্ মকবুল। নামের আগে শাহ্ কী কারণে আছে জানি না। মনে হয় আমরা শাহ্ বংশ। আমার পিতার নাম শাহ্ জলিল। দাদার নাম শাহ্ মুদচ্ছের। আমি এই পর্যন্তই নাম জানি, এর বেশি জানি না। শাহ্ বংশ বলে কিছু আছে কি-না আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনি লেখক মানুষ। লেখকরা অনেক কিছু জানেন। আমি একজন প্রুফ রিডার। আপনার মতো অনেক লেখকের লেখার প্রুফ আমি দেখি। মাঝে মাঝে এমন চমক খাই। একবার এক লেখকের লেখায় পড়লাম উইপোকা জন্মান্ধ। এক জীবনে কত উইপোকা দেখেছি, কিন্তু কখনো জানতাম না তারা জন্মান্ধ। আমি যে অশিক্ষিত, মূর্খ তাও না, বিএ পাস করেছি। রেজাল্ট ভালো হয় নি। তারপরেও বিএ ডিগ্রির আলাদা ইজ্জত আছে। গ্র্যাজুয়েট হওয়া সহজ বিষয় না। স্যার, আমি কি ভুল বললাম ?

আমি হাই চাপতে চাপতে বললাম, না।

শাহ মকবুল আমার সামনে বসা। প্রুফ নিয়ে এসেছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। সে বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে। আমি ভদ্রতা করে তাকে চা খেতে বলে বিপদে পড়ে গেছি। সে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গল্প শুরু করেছে। আমি গল্পের মাঝখানে উঠে যেতে পারছি না। এতটা নিষ্ঠুরতা দেখানো যাচ্ছে না। আমি নিজে গল্প লিখি। কোনো পাঠক আমার গল্পের শুরুটা পড়ে উঠে গেলে আমার যেমন খারাপ লাগবে, শাহ মকবুলের নিশ্চয়ই ততটাই খারাপ লাগবে।

স্যার, আপনার কি কোনো জরুরি কাজ আছে?

আমি বললাম, খুব জরুরি কাজ অবশ্যি একটা আছে।

শাহ্ মকবুল বলল, আমি চা-টা শেষ করেই চলে যাব। আমার কারণে আপনার কাজের ক্ষতি হয়ে গেল।

আমি বললাম, তেমন কিছু ক্ষতি হয় নি। তুমি ধীরে সুস্থে চা শেষ করো।

আর এক চুমুক দিলেই চা শেষ হয়ে যাবে। শেষ চুমুকটা দেয়ার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করব যদি বেয়াদবী না নেন। স্যার, আপনার সঙ্গে তো আমার প্রায় এক বছরের উপর পরিচয়। আপনার দু'টা বইয়ের সেকেণ্ড প্রুফ আমি দেখেছি। আপনার কি কখনো মনে হয়েছে আমি পাগল?

অবশ্যই না।

কথা একটু বেশি বলি। কথা বেশি বলা পাগলের লক্ষণ না। অনেকেই বেশি কথা বলে। পাগলরা বরং কম কথা বলে।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, তুমি পাগল না। এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

শাহ্ মকবুল বলল, এটা কি স্যার আপনি লিখিতভাবে বলবেন?

কেন বলো তো?

আমি-বিশিষ্টজনদের সার্টিফিকেট জোগাড় করছি। অনেকেই লিখিতভাবে দিয়েছেন। আজাদ পাবলিকেশনের মালিক আব্দুস সোবাহান সাহেব দিয়েছেন। উনার মেজোমেয়ের জামাই নুরুন নবি বার এট ল, উনিও দিয়েছেন। একজন ব্যারিস্টারের সার্টিফিকেট পাওয়া তো সহজ কথা নয়। স্যার কী বলেন?

অবশ্যই।

কবি-সাহিত্যিকদের সার্টিফিকেটও আমার অনেক জোগাড় হয়েছে।

আচ্ছা যাও আমি লিখিতভাবেই দিব। যেটা বিশ্বাস করি, সেটা লিখিতভাবে বলতে আমার অসুবিধা নেই।

আমার কথা শেষ হওয়া মাত্র শাহ্ মকবুল পাঞ্জাবির পকেট থেকে কম্পিউটারে কম্পোজ করা A4 সাইজের একটা কাগজ বের করল। সেখানে লেখা—

> যার জন্যে প্রযোজ্য
>
> শাহ্ মকবুল,
>
> পিতা : শাহ্ জলিল,
>
> গ্রাম : নিষিন্দা,
>
> জেলা : নেত্রকোনা। আমার পূর্ব পরিচিত। সে পাগল নহে।
> (পূর্ণ নাম)
> ঠিকানা :
> পেশা :
> তারিখ :

আমি নাম সই করতে করতে কৌতূহলী হয়ে বললাম, কী করবে এই সার্টিফিকেট দিয়ে?

শাহ্ মকবুল বলল, আমার একটা শখ। শখের তোলা আশি টাকা। স্যার আপনার কি একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি আছে? ছবিটাও ফরমটার সঙ্গে আঠা দিয়ে আটকে রাখব। দস্তখত দেখে মানুষ চেনা যায় না। ছবি দিয়ে চেনা যায়।

আমি খুঁজে পেতে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবিও এনে দিলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে। শাহ্ মকবুল বিদায় হলো। যাবার আগে তার বিশেষ কায়দায় কদমবুসি করল। পা স্পর্শ না করে পায়ের সামনের মেঝে স্পর্শ করে সালাম। কদমবুসি না বলে মেঝেবুসি বলা যেতে পারে।

মানুষের বিচিত্র শখ নিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হবার বয়স আমার না। সেই শখের তোলা আশি টাকা হলেও না। আমি আমার এক জীবনে বহু বিচিত্র শখের মানুষ দেখেছি। চিটাগাং রেলওয়ে কলোনিতে জয়নাল নামের এক রেলওয়ে কর্মচারী ছিলেন, যার শখ খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর মাগুর মাছের মাথা (যেদিন মাগুর মাছ রান্না হয় সেদিন) ধুয়ে মুছে জমা করে রাখা। তাঁর সঞ্চয়ে তিনশ'র ওপর মাগুর মাছের মাথা ছিল। মাগুর মাছের মাথা জমানো যেমন নির্দোষ শখ, 'আমি পাগল না'-জাতীয় সার্টিফিকেট জমানোও নির্দোষ শখ। নির্দোষ শখ নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমি শাহ্

মকবুলের কথা ভুলেই গেলাম। সে প্রুফ নিয়ে আসা-যাওয়া করে, আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না।

একদিন একটু অন্যভাবে দেখা হয়ে গেল। আমার স্ত্রী (শাওন) আগ্রহ নিয়ে কী একটা নাটক দেখছে দেখে আমি পাশে বসলাম। প্রেমবিষয়ক যে সব নাটক হয় সেরকমই একটা নাটক। নায়ক-নায়িকা ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ফুচকা নিয়ে খাচ্ছে। খুবই অস্বাভাবিক সব ডায়ালগ দিচ্ছে। যেমন নায়ক বলছে— আমার জীবনটাই ফুচকা। কামড়ে কামড়ে কে যেন শেষ করে দিচ্ছে। নায়িকা বলল— তাহলে এখন থেকে তোমাকে আমি ডাকব ফুচকা কুমার। বলেই সে বিকট হাঁ করল। নায়ক তার মুখে আস্ত একটা ফুচকা ঢুকিয়ে দিল। নায়িকা কামড় দিল নায়কের আঙুলে।

পুরো বিষয়টাই হাস্যকর। কিন্তু আমার নজর আটকে গেল অন্য জায়গায়, ফুচকাওয়ালার দিকে। ফুচকাওয়ালা আমাদের শাহ্ মকবুল। নায়ক-নায়িকার কথা শোনা ছাড়া তার করণীয় কিছুই নেই। কিন্তু এই কাজটা সে করল প্রফেশনাল অভিনেতাদের মতো। মাঝে মাঝে আগ্রহ নিয়ে নায়ক-নায়িকার কথা শোনে। মুচকি হাসে। একটা ফুচকা বানিয়ে এক ফাঁক খেয়ে ফেলল। পকেট থেকে সিগারেট বের করল। ধরাবে কী ধরাবে না কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবার পকেটে রেখে দিল। ডিরেক্টর সাহেব যদি এসব তাকে বলে দিয়ে থাকেন, তাহলে বলতেই হবে তিনি বড় ডিরেক্টর। নায়ক-নায়িকার অভিনয় দেখে আমার অবশ্যি সেরকম কিছু মনে হলো না।

পরের বার শাহ্ মকবুল যখন প্রুফ নিয়ে এলো, আমি বললাম, এই তুমি অভিনয় করো না-কি ?

মকবুল মাথা নিচু করে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, টুকটাক করি স্যার।

তোমার অভিনয় কিন্তু ভালো।

ভালো পার্ট পাই না স্যার। ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা এইসব পাই।

তোমার ফুচকাওয়ালার একটা অভিনয় দেখেছি, নাটকের নাম জানি না। সেখানে তুমি ফুচকা বিক্রি করার সময় যে কাজগুলো করেছ, সেগুলো কি তোমাকে ডিরেক্টর শিখিয়ে দিয়েছেন, না নিজে নিজে করেছ ?

শাহ্ মকবুল মাথা নিচু করে বলল, ডিরেক্টর সাহেব তো নায়ক-নায়িকা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আমরা কে ? যা করার নিজে নিজেই করেছি। নাটকের নাম— হৃদয়ের ভগ্ন জানালা।

নাটক কেমন হয়েছে জানি না। তোমার অভিনয় ভালো হয়েছে। বেশ ভালো হয়েছে।

শাহ্ মকবুল তার বিশেষ কায়দায় কদমবুসি করল। অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, আপনার তো অনেক জানাশোনা। যদি একজনকে বলে দেন ডায়ালগ আছে এমন একটা পার্ট যদি দেয়। সারাজীবন আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

কেনা গোলাম হবার দরকার নেই, আমি বলে দেব।

ডাইরেক্টর মিজান ভাইকে যদি বলে দেন। উনি আপনার বিশেষ ভক্ত।

আমি বলে দেব।

উনার মোবাইল নাম্বারটা কি আপনাকে লিখে দিয়ে যাব স্যার ?

দিয়ে যাও।

শাহ্ মকবুল মোবাইল নাম্বার লিখে দিয়ে চলে গেল। আমার টেলিফোন করা হলো না। ক্রটিটা আমার না। ক্রটি শাহ্ মকবুলের। শাহ্ মকবুল সেই শ্রেণীর মানুষ— চোখের সামনে থেকে সরে গেলে যাদের কথা মনে থাকে না।

মাঝারি আকৃতির ছোটখাটো মানুষ। বিড়ালের মতো নিঃশব্দে হাঁটে। নিঃশব্দে চলাফেরা করে। তার চলাফেরা কথাবার্তায় একটি জিনিসই প্রকাশ পায়— আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ। রাস্তায় সিএনজি বেবিটেক্সিগুলোর মতো। যাদের পেছনে লেখা থাকে—

আমি ছোট। আমাকে ধাক্কা দেবেন না।

এক ছুটির দিনের কথা। বেলা করে ঘুম থেকে উঠেছি। আয়োজন করে চা খাচ্ছি। হাতে পত্রিকা। মামারারি-কাটাকাটির খবর দিয়ে যেন দিনের শুরু না হয় সেজন্যে ভিতরের দিকের পাতা পড়ছি। সংস্কৃতি সংবাদ। এক মডেল কন্যার বিশাল ছবি ছাপা হয়েছে। স্লিভলেস জামা গায়ের এই নায়িকার বয়স সতের। তিনি 'ইন্টার' পাস করেছেন। তাঁর পছন্দ-অপছন্দের বিশাল তালিকা ছাপা হয়েছে। আমি আগ্রহ নিয়ে পড়ছি। তিনি জানাচ্ছেন যে, অশ্লীল ছবিতে তিনি কখনোই অভিনয় করবেন না। ভালো সামাজিক ছবিতে অভিনয় করবেন। এবং ছবির স্বার্থে চুম্বন দৃশ্য করতে তিনি রাজি আছেন। তাঁর আদর্শ মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সঃ), প্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খান। প্রিয় লেখক শেক্সপিয়র, কার্লমার্কস এবং ভিক্টর হুগো। ভিক্টর হুগোর কোন্ কোন্ বই পড়েছেন জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, প্রায় সব বই-ই পড়েছেন, তবে এই মুহূর্তে বইয়ের নাম মনে করতে পারছেন না। মডেল কন্যার প্রিয় রঙ নীল। প্রিয় খাদ্য চেপা শুঁটকি এবং পিজা।

মডেল কন্যার শখ এবং প্রিয় অপ্রিয়ের তালিকা পড়ে যথেষ্টই আনন্দ পেলাম। এরকম আনন্দদায়ক আইটেম আরো আছে কি-না দেখতে গিয়ে

শাহ্ মকবুলের ছবির দিকে চোখ আটকে গেল। সে এই প্রান্তিকের সেরা অভিনেতার পুরস্কার নিচ্ছে। মিজানুর রহমানের মেগা সিরিয়েল হলুদ কাল নীল-এ সে মতি পাগলের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছে। মতি পাগলের একটা ডায়ালগ সুপার হিট করেছে। লোকজনের মুখে মুখে ফিরছে। ডায়ালগটা হচ্ছে— 'ভাত খামু না চাপায় বেদনা'। বেশ কিছু রিকশা, বেবিটেক্সি এবং বাসের পেছনে এখন নাকি এই কথা লেখা।

আমি ঘর থেকে বিশেষ বের হই না বলে 'ভাত খামু না চাপায় বেদনা' লেখা আমার দেখা হয় নি। তবে শাহ্ মকবুল যে অভিনয় নিয়ে যথেষ্টই ব্যস্ত এটা বুঝলাম যখন দেখলাম প্রুফ নিয়ে সে আসা-যাওয়া করছে না। অন্য একজনকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অবসর সময়ে টিভি দেখার অভ্যাসও আমার নেই। কাজেই শাহ্ মকবুল অভিনয় কেমন করছে তাও জানি না।

একদিন শাওন খুবই উত্তেজিত গলায় বলল, তোমার ঐ লোক তো ফাটাফাটি অভিনয় করে।

আমার কোন লোক?

ঐ যে প্রুফ রিডার মকসুদ না মকবুল কী নাম। মতি পাগলার ভূমিকায় অভিনয় করছে দেখে মনেই হয় না অভিনয়। দেখে মনে হয় সত্যি সত্যি কোনো এক পাগলকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছে। গলার মডুলেশন এত চমৎকার।

'ভাত খামু না চাপায় বেদনা' যে সত্যি হিট করেছে তার একটা প্রমাণ পেলাম। গাড়ি করে গাজীপুর যাচ্ছি। সিগন্যালে গাড়ি থেমেছে। ফুল বিক্রি করে ছেলেমেয়েরা প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। এর মধ্যে আট'ন বছর বয়েসী একটা মেয়ের চেহারা এতই মায়াকাড়া। তার হাতে ছোট ছোট হলুদ রঙের কয়েকটা গোলাপ। গোলাপের চেয়েও মেয়েটার চেহারা সুন্দর লাগছে। গোলাপগুচ্ছের দাম পনেরো টাকা। আমি তাকে বিশ টাকার নোট দিয়ে বললাম, 'এই টেকা দিয়া রুটি কিন্যা খামু। ভাত খামু না চাপায় বেদনা।' বলেই সে ফিক করে হেসে ফেলল।

আমি ধরেই নিলাম প্রুফ রিডার মতির দেখা আর পাওয়া যায় না। সে প্রুফ ভালো দেখত তাতে সন্দেহ নেই। আমার মতো বানানে দুর্বল লেখকের জন্যে এটা দুঃসংবাদ। নতুন প্রুফ রিডার আবদুস সাত্তার নানান যন্ত্রণা করছে, কথ্য কথাবার্তা সে নিজ দায়িত্বে সাধুভাষা করে দিচ্ছে। উদাহরণ দেই— আমি লিখলাম, বিরাট ভুখ লাগছে। চা খামু না। ভাত দেও।

সে শুদ্ধ করে ঠিক করল— খুব ক্ষুধা লেগেছে। চা পান করব না। ভাত দাও।

আমার মাথায় বাড়ি। সে শুধু যে ভাষা ঠিক করছে তা-না। কিছু কিছু অংশ ফেলেও দিচ্ছে। কাজটা কেন করছে জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না। রাগী রাগী চোখে তাকিয়ে থাকে। এর চেহারাও সন্ত্রাসীর মতো। কঠিন ধমক দিতে ভয় লাগে। আমার লেখালেখি বন্ধ হবার জোগাড়।

দিন দশেকের মাথায় সমস্যার সমাধান হলো। এক সকালে চা খাচ্ছি— শাহ্ মকবুল কাটা প্রুফ নিয়ে উপস্থিত। আমি আনন্দিত গলায় বললাম, আরে মকবুল তুমি?

মকবুল বলল, স্যার অভিনয় ছেড়ে দিয়েছি। আমার পুষল না।

পুষল না কেন?

সবাই পাগলের চরিত্র করতে বলে। আমি পাগল করব না। রাস্তায় যখন বের হই, লোকে ভাবে পাগল।

অভিনয় যে ভালো করছ এটা তার প্রমাণ।

সবাই পাগল বললে একসময় পাগল হয়ে যাব। জগতের এটাই নিয়ম। মানুষের মুখে যা রটে তাই হয়।

কে বলল এই কথা?

আপনার লেখার মধ্যেই পড়েছি স্যার। আপনি লিখেছেন, মানুষের মুখে জয় মানুষের মুখে ক্ষয়। কোন লেখা সেটা মনে নাই। এটার অর্থ মানুষ যাকে নিয়ে জয় জয় করে তার জয় হয়। আর যাকে নিয়ে ক্ষয় ক্ষয় করে তার ক্ষয় হয়। অর্থটা কি স্যার ঠিক আছে?

হ্যাঁ, ঠিকই আছে।

শুটিং-এ যখন যাই তখন ডিরেক্টর সাহেব বলেন, এই পাগলাটারে এক কাপ চা দে। মনটা এত খারাপ হয়। প্রডাকশনের ছেলেপেলেরা আমাকে ডাকে পাগলা স্যার।

আমি বললাম, আমাদের সমাজে পাগল বা পাগলা আদর অর্থে ব্যবহার হয়। আমরা যখন বলি, ছেলেটা পাগলা আছে তখন বুঝতে হয় ছেলের কাজকর্ম মজার।

স্যার, আমি পাগলের আর কোনো চরিত্র করব না।

আচ্ছা ঠিক আছে। চা খাও।

সে চা খেতে কাটা প্রুফ মিলাতে বসল। ঘণ্টাখানিক লাগবে। কাজ শেষ করে আমাকে দেখিয়ে চলে যাবে। আমি শোবার ঘরে চলে এলাম। নতুন একটা রকিং চেয়ার কেনা হয়েছে। দোল খেতে খেতে টিভির চ্যানেল বদলাতে

মজা লাগে। দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে চ্যানেল বদলাচ্ছে। ঠিকমতো সিনক্রোনাইজ করতে পারলে আনন্দময় ব্যাপার। দুলুনি থামতে হলো, কারণ কাজের ছেলে এসে বলল, 'লোকটা কানতেছে।' আমি তৎক্ষণাৎ উঠে গেলাম। শাহ মকবুল লাল নীল পেনসিল নিয়ে মেঝেতে উবু হয়ে বসেছে। প্রুফ দেখছে যথেষ্ট মন লাগিয়ে, একই সঙ্গে টপটপ করে চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

আমি বললাম, মকবুল, কী হয়েছে ?

মকবুল আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, মনটা খারাপ।

কেন ?

আপনার একটা লাইন পড়ে হঠাৎ মনটা খারাপ হয়েছে। আর ঠিক হচ্ছে না। আমার এরকম হয়।

কোন লাইনটা ?

মকবুল লাল কালিতে দাগ দিয়ে প্রুফ আমার হাতে দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। মন খারাপ করার মতো কোনো লাইন না। লেখা আছে— সালমা বলল, তুমি মনে করে একটা ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ কিনে এনো। মনে থাকবে তো ? তোমার তো আবার কিছুই মনে থাকে না।

আমি বললাম, সালমা নামের পরিচিত কেউ কি আছে ?

মকবুল বলল, জি-না স্যার। স্বামীর-স্ত্রীর মিল মুহাব্বতের কথা কী সুন্দর করে লিখেছেন।

আমি বললাম, মকবুল, তুমি বিয়ে করছ ?

মকবুল বলল, জি-না স্যার। বিএ পরীক্ষার রেজাল্ট হবার দুই মাস পরে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। মেয়ের নাম জাহেদা। বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল। তারপর আর বিয়ে করি নাই।

কত বছর আগে বিএ পাস করেছ ?

পনেরো বছর আগে।

জাহেদা কি খুব রূপবতী ছিল ?

স্যার, আমি দেখি নাই। আমার বড়খালা দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন মেয়ে শ্যামলা, তবে মুখের কাটিং ভালো। মাথায় চুল আছে। ইন্টার পাস। গ্রামের মধ্যে ইন্টার পাস মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তারচে' বড় কথা শ্যামলা মেয়ের অন্তর হয় ফর্সা, আর ফর্সা মেয়ের অন্তর হয় শ্যামলা।

কে বলেছে ?

আপনার এক লেখাতে পড়েছি।

বিয়েটা ভাঙল কেন ?

মকবুল ধরা গলায় বলল, বিরাট হিস্টোরি স্যার। শুনলে আপনার খারাপ লাগবে।

খারাপ লাগলে লাগবে। শুনি তোমার গল্প।

আপনি যদি লিখে ফেলেন বিরাট বেইজ্জত হব।

আমি লিখব না। শোনা গল্প আমি কখনো লিখি না।

আর লিখলেও ক্ষতি নাই। কেউ তো আর বুঝবে না আপনি আমার মতো অধমরে নিয়া লিখছেন। ঠিক বলেছি স্যার ?

ঠিকই বলেছ।

গল্পটা শুরু করি স্যার। আমার বাবারে দিয়া শুরু করি। আসলে এই গল্প উনারই। আমি কেউ না। আমার বাবা ছিলেন পাগল। আমার বিবাহে বরযাত্রী হয়ে বাবা সঙ্গে গিয়েছিলেন। সব ঠিকঠাক ছিল। বাবা ছিলেন শান্ত। সবার থেকে সামান্য দূরে একটা কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন। কাজি আসতে বিলম্ব করছিল এই জন্য অপেক্ষা। দিনটা ছিল শুক্রবার। এই দিনে গ্রামাঞ্চলে অনেক বিয়ে শাদি পড়ানো হয়। কাজিরা থাকেন ব্যস্ত। কপালের ফের এরেই বলে। কাজি যদি দেরি না করতেন, তাহলে আমার বিয়েটা হয়ে যায়। এত দিনে তিন চারটা ছেলেমেয়ে হয়ে যেত। যদিও সরকার বলছে ছেলে হোক মেয়ে হোক একটি সন্তানই যথেষ্ট, কিন্তু আমার বাড়িভর্তি ছেলেমেয়ের শখ। ছেলেমেয়েরা চিল্লাপাল্লা করবে আমোদ ফুর্তি করবে। তাদের মাতা চড়-থাপ্পড় মারবে এর নাম সংসার।

মকবুল, তুমি বাড়তি কথা না বলে মূল গল্পটা বলো। বিয়েটা কীভাবে ভাঙল।

আমার বাবা শাহ্ জলিল একটু দূরে কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন। কন্যার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পান খাবেন কি-না। বাবা বলেন, আমি চা-পান বিড়ি সিগারেট এইসব খাই না।

কন্যার পিতা বললেন, লেবুর সরবত করে দেই, সরবত খান।

বাবা বললেন, আচ্ছা।

কন্যার পিতার সরবত আনতে গেলেন, তখন হঠাৎ বাবার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। তিনি চিৎকার শুরু করেন— 'আমি বিবাহ করব না। আমি বিবাহ করব না।'

চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল। পাগলের যে-কোনো কথায় লোকজন হাসে। আর এই পাগল হাসির কথাই বলছে। ছেলেকে বিবাহ করাতে এসে বলছে— আমি বিবাহ করব না। বিরাট বেইজ্জতি ব্যাপার।

কন্যার এক মামা বিডিআর-এ কাজ করেন। নন কমিশন্ড অফিসার। সুন্দর চেহারা, কথাবার্তায় অতি ভদ্র। তিনি এসে হাতজোড় করে বললেন, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, কন্যার মা কান্নাকাটি করতেছেন। তিনি এইখানে মেয়ে বিবাহ দিবেন না।

আমাদের সঙ্গেও ভালো ভালো লোকজন ছিল। নেত্রকোনা কোর্টের উকিল অধর বাবু ছিলেন। দেওয়ানি ফৌজদারি দুই মামলাতেই তিনি মারাত্মক। তিনি একবার এক সাক্ষিকে এমন জেরা করলেন যে, সাক্ষি এজলাসে পেসাব-পায়খানা করে ফেলল। জজ সাহেব বিরক্ত হয়ে অধর বাবুকে দশ টাকা ফাইন করলেন। মেথর দিয়ে এজলাস পরিষ্কার করার খরচও অধর বাবুকে দেয়া লাগল।

মকবুল, মূল গল্পটা বলো। শাখা-প্রশাখা বাদ দাও।

কন্যার মামার কথা শুনে অধর বাবু গেলেন ক্ষেপে। তিনি বললেন, কন্যার মা এইখানে কন্যার বিবাহ দিবেন না, ভালো কথা। মা হিসাবে এই কথা বলার অধিকার অবশ্যই তাঁর আছে। আমরা তাঁর কথাকে সম্মান করি। কিন্তু এই কথা তিনি আগে কেন বললেন না। শেষ সময়ে কেন বললেন। ছেলের বাবার মাথা যে সামান্য গরম এই কথা তো কন্যার মাতা আগেই জানতেন। এমন তো না যে আজ প্রথম খবর পেয়েছেন। আমরা ছেলে বিবাহ দিতে এসেছি। ছেলে বিবাহ দিব। কন্যা ছাড়া গ্রামের ফিরে বেইজ্জত হব না। আপনারা যদি বিবাহ না দেন— দুই তিনটা ধারায় ফৌজদারি মামলা হবে। কারোর কারোর চার-পাঁচ বছরের জেল জরিমানা হবে। এখন বুঝে দেখেন। আমি অধর উকিল। আইনের কথা বুঝি। আইন ছাড়া কিছু বুঝি না।

বিরাট তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। হৈচৈ চিৎকার। ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছেন শুধু অধর বাবু।

অধর বাবুর বক্তৃতায় কাজ হলো। এদিকে বাপজান সামান্য ঠাণ্ডা হয়েছেন। চেয়ারে এসে বসেছেন। গায়ের পাঞ্জাবি খুলে ফেলেছিলেন, সেই পাঞ্জাবি আবার পরেছেন। কাজি সাহেবও চলে এসেছেন। কন্যার বাবা বললেন, বিবাহ হবে— দুইজন আসেন। মেয়ের এজিন নিয়ে যান।

আমাদের দুই মুরব্বি এজিন আনতে গেলেন। অধর বাবুও সঙ্গে গেলেন। উনি বিচক্ষণ লোক। উনি দেখবেন সব ঠিকঠাক হচ্ছে কি-না।

হঠাৎ শুনি ভিতর থেকে চিৎকার। হৈচৈ। মনে হচ্ছে মারামারি শুরু হয়েছে। কিছু বুঝে উঠার আগেই এক দল লাঠিসোঠা নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। কী যে ভয়ঙ্কর অবস্থায়। ষণ্ডাগুণ্ডা ধরনের জোয়ান ছেলেপুলে। কন্যার বাবা এবং মামা মারামারি থামানোর চেষ্টা করছেন। ছোটাছুটি করছেন। কোনো লাভ হচ্ছে না। এই সময় তারা এসে আমার গলা চেপে ধরল। আমাকে মেরেই ফেলত। তখন বিয়ের কন্যা জাহেদা ছুটে এলো। সে না এলে আমাকে মেরে ফেলত।

আমি বললাম, তুমি বলেছিলে বিয়ের কন্যা জাহেদাকে আগে দেখ নি। তোমার বড় খালা দেখেছিলেন।

স্যার, মিথ্যা বলেছিলাম।

কেন ? মানুষ উদ্দেশ্য ছাড়া মিথ্যা বলে না। তোমার উদ্দেশ্যটা কী ?

স্যার, আপনি জ্ঞানী মানুষ। আপনি উদ্দেশ্য খুঁজে বের করেন। আমি উদ্দেশ্য জানি না। জাহেদাকে দেখেছি এটা বলতে আমার লজ্জা লাগে বলেই বলি দেখি নাই।

লজ্জা লাগবে কেন ?

বিয়ে হওয়ার কথা ছিল হয় নাই, এইটাই লজ্জা। সব মানুষ তো এক রকম হয় না স্যার। একেক মানুষ হয় একেক রকম।

তারপর কী হয়েছে বলো।

শাহ্ মকবুল স্বাভাবিক গলায় বলল, দুইজন মানুষ মারা গিয়েছিল। অধর বাবুর ঠ্যাং ভেঙে জন্মের মতো লুলা করে দিয়েছিল।

বলো কী ?

দুইজন এজিন আনতে গিয়েছিল। দুইজনেই শেষ। একজনকে গলায় ছুরি বসায়ে গরু জবাই করার মতো জবাই করেছে।

সর্বনাশ!

অনেক পত্রপত্রিকায় এই ঘটনা উঠেছে। ইত্তেফাকে লেখা হয়েছে—বিয়ের আসরে কারবালা। নিহত দুই। আহত শতাধিক।

এরপর শুরু হলো মামলা-মোকদ্দমা। অধর বাবু মামলা সাজালেন। প্রধান আসামি তিনজন। বিয়ের কন্যা জাহেদা, তার বাবা এবং তার মা। অধর বাবু নিজে একজন সাক্ষি। তিনি বললেন যে, তিনি নিজে দেখেছেন, জাহেদা গলায় ছুরি বসাচ্ছে। বাকি দুইজন চেপে ধরে আছে।

অথচ স্যার এই তিনজন কিছুই করে নাই। আটকানোর চেষ্টা করেছে। জাহেদা যদি ছুটে এসে আমাকে না আটকাত, তাহলে আমাকেও মেরে ফেলত।

তুমি সাক্ষি দাও নি ?

দিয়েছি। সত্য কথা বলেছি। আমি একা বলেছি একধরনের কথা, বাকি চল্লিশজন সাক্ষি বলেছে ভিন্ন কথা। আমার সাক্ষি কোর্ট গ্রহণ করে নাই। উকিল প্রমাণ করেছে যে, আমি পাগল। আমার বাবা পাগল, আমি ও পাগল। পাগল বলেই সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছি।

শাস্তি কী হয়েছিল?

স্যার তিনজনেরই ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। জাহেদার অল্প বয়সের কারণে এবং মেয়ে হবার কারণে হাইকোর্ট পরে যাবজ্জীবন দিয়েছে।

তুমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে যাও ?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যাই স্যার। প্রায়ই যাই। আমরা এমনভাবে কথা বলি যেন আমাদের আসলেই বিয়ে হয়েছে। আমরা স্বামী-স্ত্রী। সে আমাকে তুমি তুমি করে বলে, আমিও তাকে তুমি তুমি করে বলি। দুইজন আবার রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটিও করি।

কী নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করো ?

নাটকে পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করেছি শুনে রাগারাগি করল। তারপর একদিন রাগারাগি করল ছেলেমেয়েদের নাম রাখা নিয়ে।

ছেলেমেয়েদের নাম মানে ?

কোনো এক দিন তো জাহেদা জেল থেকে বের হবে। আমরা বিয়ে করব। আল্লাহপাকের দয়া হলে আমাদের ছেলেমেয়ে হবে। বিভিন্ন নাম নিয়ে জাহেদার সঙ্গে কথা বলি। আমার কোনো নামই তার পছন্দ হয় না। এই নিয়ে ঝগড়া। স্যার, আপনি কি আমার বড় মেয়েটার নাম রেখে দিবেন ? আমি স্বপ্ন দেখেছি আমার প্রথম সন্তান মেয়ে। জাহেদাও একই স্বপ্ন দেখেছে।

শাহ্ মকবুল শব্দ করে কাঁদছে। আমি তার পিঠে হাত রেখে বললাম, তোমাদের বড় মেয়ের নাম অবশ্যই আমি রেখে দেব। পৃথিবীর সবচে' সুন্দর নামটা তার জন্যে। তোমার মেয়ের নাম চন্দ্রাবতী। নাম পছন্দ হয়েছে ?

শাহ্ মকবুল মেঝেতে কদমবুসি করে বলল, খুব পছন্দ হয়েছে স্যার। মেয়ের মায়েরও পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ।

পিশাচ

পিশাচ গল্পটা আমি একটি সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার জন্যে লিখি। (সাহিত্য পত্রিকা এবং সম্পাদকের নাম ইচ্ছা করেই দিলাম না) ফরমায়েসী লেখা বলা যেতে পারে। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকরা বিদগ্ধ ব্যক্তি হয়ে থাকেন। তারা সাহিত্যের ভাল-মন্দ, কালজয়ী লেখা, কাল পরাজিত লেখা একবার পড়েই ধরতে পারেন। তাঁরা এক অর্থে সাহিত্যের থার্মোমিটার। এদের কাছে লেখক হিসেবে আমি জাতে উঠি যখন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় তখন। এম্নিতে আমি তাদের ভাসুর শ্রেণীর। নামও মুখে আনেন না। আকারে ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করেন যে আমি নিম্নমানের পাঠক ভুলানো লেখা লিখে সাহিত্যের কি ভয়ঙ্কর ক্ষতিই না করছি। এরাই যখন বিশেষ সংখ্যার লেখার জন্যে ঝুলাঝুলি করেন তখন নিষিদ্ধ কর্মের আনন্দের মত আনন্দ পাই।

স্যার, আমি পিশাচ সাধনা করি।

আমি কৌতূহল নিয়ে পিশাচ-সাধকের দিকে তাকালাম। মামুলি চেহারা। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় চুল নেই। শরীরের তুলনায় মাথা বেশ ছোট। সেই মাথা শারীরিক কোনো অসুবিধার কারণেই হয়তো সারাক্ষণ বামদিকে ঝুঁকে আছে। তার হাতে কালো কাপড়ে ঢাকা একটা পাখির খাঁচা। খাঁচায় যে পাখিটা আছে সেটা খুব সম্ভব কাক। পা ছাড়া পাখিটার আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কাকের পা বলেই মনে হচ্ছে।

লোকটার বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। গ্রামের অভাবী মানুষের বয়স চট করে ধরা যায় না। দুঃখ ধান্ধায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরেই তাদের মধ্যে বুড়োটে ভাব চলে আসে। আমার কাছে মনে হলো, লোকটার বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। মাথার চুল অবশ্যি বেশির ভাগই পাকা। মুখের চামড়াও ঝুলে পড়েছে।

লোকটার পরনে টকটকে লাল রঙের নতুন লুঙ্গি। গলায় একই রঙের লাল চাদর উড়নার মতো ঝোলানো। এটাই সম্ভবত পিশাচ-সাধকদের পোশাক।

সব ধরনের সাধকদের জন্যে পোশাক আছে— ড্যানসিং দরবেশরা আলখাল্লা পরেন, সন্ন্যাসীরা গেরুয়া পরেন, নাগা সন্ন্যাসীরা নগ্ন থাকেন। পিশাচ-সাধকরা লাল লুঙ্গি এবং লাল চাদর কেন পরবে না! আমি পিশাচ-সাধকের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, তুমি তাহলে পিশাচের সাধনা কর ?

পিশাচ-সাধক সব কয়টা দাঁত বের করে হাসল। আনন্দিত গলায় বলল, কথা সত্য।

লোকটার দাঁত ঝকঝকে সাদা। গ্রামের মানুষরা পান-সিগারেট খেয়ে দাঁত কুৎসিতভাবে নোংরা করে রাখে, এর বেলায় তা হয় নি।

নাম কী তোমার ?

মকবুল। স্যার, আমি পিশাচ-সাধক মকবুল। যদি অনুমতি দেন আপনেরে কদমবুসি করি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, অনুমতি দিলাম।

সে অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, পায়ে হাত দিব না স্যার। ভয়ের কিছু নাই।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, পায়ে হাত দিলে ভয়ের কী ?

পিশাচ সাধনা যারা করে তারা কারোর শইল্যে হাত দিলে বিরাট ক্ষতি হয়।

ক্ষতিটা কার হয়— তোমার, না তুমি যার গায়ে হাত দিবে তার ?

আমি যার শইল্যে হাত দিব তার। আপনের শইল্যে হাত দিলে আপনার বিরাট ক্ষতি হইব। যেখানে হাত দিব সেখানে ঘা হইব।

পায়ে হাত দাও। দেখি ক্ষতি কী হয়! ঘা হয় কি-না।

ছি-ছি! কন কী আপনে ? আপনের ক্ষতি হবে এমন কাজ পিশাচ-সাধক মকবুল করব না।

সে আমার পা থেকে এক-দেড় হাত দূরে মাটিতে হাত দিয়ে ভক্তিভরে কদমবুসি করল। কদমবুসির পর দু'হাত জোড় করে চোখবন্ধ অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করল। কে জানে পিশাচ সাধকদের কদমবুসি করার এটাই হয়তো নিয়ম। বিপুল বিশ্বের কতই বা আমি জানি।

তোমার খাঁচায় কী ? কাক না-কি ?

জি স্যার কাক। আমরা বলি কাউয়া।

তোমার কাকের ব্যাপারটা কী বলো তো ?

সাধনার জন্যে লাগে স্যার।

ও আচ্ছা।

গ্রামে বেড়াতে এলে এ জাতীয় যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে আমাকে যেতে হয়। দু'তিন দিনের জন্যে যাই। নানান ধরনের মানুষ এর মধ্যে আসে। মূল

উদ্দেশ্য অর্থ ভিক্ষা। সরাসরি ভিক্ষা চাইতে সঙ্কোচ হয় বলেই নানান কিচ্ছা-কাহিনীর ভেতর দিয়ে তারা যায়। একবার এক মওলানা সাহেব এসেছিলেন। তাঁকে নাকি আমাদের নবী-এ-করিম স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন— তোর ছেলেকে আমার রওজা মোবারকে এসে দোয়া করে যেতে বল। সে যে দোয়া করবে ইনশাল্লাহ্ তা-ই কবুল হবে। মওলানা সাহেব এসেছেন ছেলের মদিনা ভ্রমণের টাকা সংগ্রহ করতে।

এসব ক্ষেত্রে আমি কোনো তর্কে যাই না— টাকা দিয়ে দেই। তেমন বেশি কিছু না, সামান্যই। তাতেই তারা খুশি হয়। তাদের প্রত্যাশাও হয়তো অল্পই থাকে।

আমি ঠিক করেছি পিশাচ-সাধককে পঞ্চাশ টাকা দেব। পিশাচ-সাধক যে এই টাকা পেয়েই মহাখুশি হবে সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তার আনন্দ আরো বাড়বে যদি কিছুক্ষণ তার সঙ্গে গল্প করি। আমাদের অঞ্চলের গ্রামের মানুষ অলস প্রকৃতির। অলস মানুষের আনন্দ-বিলাস গল্পগুজব। হাসিমুখে কিছুক্ষণ গল্প করলেই তারা খুশি। আমি গল্প শুরু করলাম।

তুমি তাহলে পিশাচ-সাধক?

জি স্যার।

জ্বীন সাধনার কথা শুনেছি, পিশাচ সাধনার কথা শুনি নি।

পিশাচ সাধনা আরো জটিল। পিশাচ নিয়া কারবার। এরা ভয়ঙ্কর। সাধনাও কঠিন।

এমন ভয়ঙ্কর সাধনার দিকে গেলে কী জন্যে?

মন ঐদিকে টানছে। মনের উপরে তো হাত নাই। কপালগুণে ভালো ওস্তাদও পেয়েছিলাম।

ওস্তাদের নাম কী?

উনার নাম কলিমুল্লাহ্ দেওয়ানি।

নাম তো জবরদস্ত।

উনি মানুষও জবরদস্ত ছিলেন। আলিশান শরীর। কথা যখন বলতেন মনে হইতো মেঘ ডাকতেছে। এক বৈঠকে দুইটা কাঁঠাল খাইতে পারতেন।

মারা গেছেন না-কি?

জি, উনার ইন্তেকাল হয়েছে। বড়ই দুঃখের মৃত্যু। ঘটনাটা বলব?

বলো।

এক মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে তিনি ঘর থাইক্যা বাইর হইছেন। মনের বেখেয়ালে শরীর বন্ধন দেন নাই। পিশাচ আইসা ধরল। মট কইরা একটা শব্দ হইল। মাথায় মোচড় দিয়া দিল ঘাড় ভাইঙ্গা।

পিশাচ সাধনা দেখি খুবই বিপদজনক ব্যাপার।

বিপদ বলে বিপদ! চিন্তায় চিন্তায় অস্থির থাকি। ভুলভ্রান্তি হইলে বাঁচনের উপায় নাই।

পিশাচ-সাধককে দেখে অবশ্যি আমার মনে হলো না সে কোনোরকম চিন্তায় আছে। তাকে বরং আনন্দিতই মনে হলো।

খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

জি-না, খাওয়া হয় নাই।

খাওয়া-দাওয়াতে কোনো বাছ-বিচার আছে?

জি-না, আমরা সবই খাইতে পারি। তবে টক খাওয়া নিষেধ। টক ছাড়া সবই চলে। মাছ-মাংস-ডিম-দুধ... অসুবিধা কিছু নাই।

আমি মানিব্যাগ খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে খুবই আগ্রহের সঙ্গে নোটটা নিল। আবারো কদমবুসি। আবারো হাত জোড় করে চোখবন্ধ অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড়ানি। খাঁচায় বন্দি কাকও এইসময় ডানা ঝাপ্টাতে শুরু করল। কফ লাগা গলায় কয়েকবার বলল, কা কা। মোটামুটি রহস্যময় দৃশ্য।

মকবুল বলল, স্যারের সঙ্গে কথা বইল্যা আরাম পাইছি। জমানা খারাপ, মানুষের সাথে কথা বইল্যা এই জমানায় কোনো আরাম নাই। এই জমানা হইল অবিশ্বাসের জমানা। কেউ কারো কথা বিশ্বাস করে না। আমারে নিয়া হাসাহাসি করে। স্যার, আমারে চাইরটা ভাত দেওনের হুকুম দিয়া দেন। আপনে হুকুম না দিলে এরা ভাত দিব না। একবাটি মুড়ি খাওয়াইয়া বিদায় কইরা দিব।

ভালোমতো যাতে খাওয়া-দাওয়া করতে পার সে ব্যবস্থা করছি।

খাওয়া খাদ্য না পাইলেও আমরার স্বভাব-চরিত্রও পিশাচের মতো। তিন চাইর দিন না খাইলেও আমরার কিছু হয় না। আবার ধরেন মরা লাশ পইড়া আছে, প্রয়োজনে লাশের মাংসও খাইতে পারব, অসুবিধা নাই।

খেয়েছ কখনো?

জি-না।

খাও নি কেন?

প্রয়োজন পড়ে নাই। তাছাড়া লাশ পাওয়াও যায় না। হিন্দুরা লাশ পুড়ায়ে ফেলে। মুসলমানরা দেয় করব। করব থাইক্যা লাশ বাইর কইরা খাওয়া বিরাট দিকদারি। ঠিক না স্যার?

ঠিক তো বটেই। তোমার সাধনার ফলাফল কী? পিশাচ বশ মানবে?

অবশ্যই। আমি নিজেও পিশাচের মতো হয়ে যাব। দিলে মায়া-মুহব্বত কিছু থাকব না। ইচ্ছা হইল খুন করলাম, থানা-পুলিশ কিছু করতে পারব না।

খুন করতে ইচ্ছা করে ?

জে-না, করে না।

তাহলে এত কষ্ট করে সাধনা করছ কেন ? সাধনা করে পিশাচ হবার দরকারইবা কী! আমাদের সমাজে পিশাচের তো অভাবও নেই। সাধনা ছাড়াই অনেক পিশাচ আছে।

কথা সত্য বলেছেন। তবে স্যার ঘটনা হইল পিশাচ সাধনা থাকলে— লোকজন ভয় খায়। সমীহ করে। একজন পিশাচ-সাধকরে কেউ তুই তুকারি করবে না। আপনে আপনে করবে। কারোর বাড়িতে গেলে মাটিতে বসতে হবে না। চিয়ার দিবে। যার চিয়ার নাই সে জলচৌকি দিবে। মুড়ি খাওয়াইয়া বিদায় দিবে না, গরম ভাত দিবে। সালুন দিবে। দিবে কি-না বলেন ?

দেওয়া তো উচিত।

বিপদে-আপদে সবেই ছুইটা আসবে আমার কাছে। এর বান মারতে হবে। তারে বশিকরণ মন্ত্র দিতে হবে। বান ছুটাইতে হবে। পিশাচ-সাধকের কাজের কি শেষ আছে ? ঠিক বলেছি না স্যার ?

ঠিকই বলেছ।

টাকা-পয়সা ধনদৌলতেরও তখন সমস্যা নাই। জমি-জিরাত করব। ঘরবাড়ি করব। শাদি করব। আমি স্যার অখনো শাদি করি নাই। ঘর নাই, দুয়ার নাই। খাওয়া খাদ্য নাই। আমার কাছে মেয়ে কে দিব কন ?

পিশাচ-সাধকের কাছেও কি আর মেয়ে দিবে ? মেয়ের বাবা-মা'র কাছে পিশাচ পাত্র হিসাবে ভালো হবার কথা না।

মকবুল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, সেইটা কোনো বিষয় না স্যার। সাধনার শেষে যারে ইচ্ছা তারে আমি বিবাহ করতে পারব। পিশাচই ব্যবস্থা কইরা দিবে। আমার কিছু করতে হবে না।

তাই না-কি ?

অত কষ্ট কইরা সাধনা যে করতেছি বিনা কারণে তো করতেছি না। আমি তো বেকুব না। এই যে আপনার সঙ্গে এত গল্প কলাম, আপনার কি মনে হয়েছে আমি বেকুব ?

তা মনে হয় নাই।

পিশাচ সাধনায় যারা পাস করে, তারা ইচ্ছা করলে অন্যের বিবাহিত ইসতিরিরেও বিবাহ করতে পারে। যেমন মনে করেন, এক লোক তার পরিবার নিয়া সুখে আছে। তার দুইটা ছেলেমেয়েও আছে। আমি পিশাচ সাধনায় পাস করা মকবুল যদি সেই লোকের পরিবাররে বিবাহ করতে চাই, তাইলে সঙ্গে সঙ্গে তারার সুখের সংসারে আগুন লাগব। ছাড়াছাড়ি হইয়া

Doridro.com

যাইব। আমি আপোসে সেই মেয়েরে বিবাহ করব। সেই মেয়েও আমার জন্যে থাকবে দিওয়ানা।

এরকম কোনো পরিকল্পনা কি আছে ?

পিশাচ-সাধক মকবুল মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, এটাই তার পিশাচ-সাধনার মূল প্রেরণা। ঠোঁটের কোণে হাসিও দেখা যাচ্ছে।

কাকে বিয়ে করতে চাও। মেয়েটা কে ?

আমার মামতো বোন— নাম কইতরি। তার বিবাহ হয়ে গেছে। নবীনগরের কাঠমিস্ত্রি ইসমাইলের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। তারার দুইটা পুত্রসন্তানও আছে। সুখের সংসার। অন্যের সুখের সংসার ভাঙলে বিরাট পাপ হয়। আমি পিশাচ, আমার আবার পাপপুণ্য কী ? ঠিক বলেছি না স্যার ?

আমি জবাব দিলাম না। মানুষটার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলাম। কাকের খাঁচা নিয়ে আমার সামনে যে উঁবু হয়ে বসে আছে, সে কোনো সাধারণ মানুষ না। পিশাচ সাধনা করুক বা না করুক, সে বিরাট প্রেমিকপুরুষ।

মকবুল গলা নামিয়ে বলল, কইতরির চেহারা এমন কিছু না। গায়ের রঙ শ্যামলা। মাথার চুল অল্প। সন্তান হওনের পরে বেজায় মোটা হয়েছে। কিন্তু স্যার তার জন্যে সবসময় কইলজা পুড়ে। বুক ধড়ফড় করে। রাইতে ঘুম হয় না। আমি থাকি নবীনগরে। একদিনের জন্যেও নবীনগর ছাইড়া যাইতে পারি না। এই যে আপনের কাছে আসছি, একটা দিন থাকলে আপনের ভালোমন্দ দুইটা কথা শুনতে পারি— সেই উপায় নাই। আমার নবীনগর যাইতেই হবে।

কইতরির সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয় ?

জে-না। তার বাড়ির সামনে দিয়া হাঁটাহাঁটি করি। কৃচিৎ তারে দেখি। একদিন দেখেছি তার ছেলেটারে নিয়া পুসকুনির দিকে যাইতেছে। সে আমারে দেখে নাই। ছেলে দুইটাও সুন্দর হয়েছে মাশাল্লাহ। বড়টার নাম গোলাপ, ছোটটার নাম সুরুজ।

সব খবরই দেখি রাখ।

কী বলেন স্যার, রাখব না! আপনে একটু দোয়া কইরেন, পিশাচ সাধনা যেন তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি।

তুমি সাধনার কোন পর্যায়ে আছ ?

মাত্র শুরু করেছি, সময় লাগব। পানিতে চুবাইয়া দশটা কাউয়া মারণ লাগব। এইটা এখনো পারি নাই। এই কাউয়াটা সাথে নিয়া ঘুরতেছি ছয় মাসের উপরে হইছে। দুইবার পুসকুনিতে নামছি এরে চুবাইয়া মারার জন্যে,

দুইবারই উইঠা আসছি। জীবন্ত একটা প্রাণী পানিতে চুবাইয়া মারা তো সহজ কথা না। একবার পানিতে ডুবাইয়াই টান দিয়া তুললাম। কাউয়া কিছু বুঝে নাই। হে ভাবছে আমি তারে গোসল দিছি। পশুপাখির বুদ্ধি তো আমরার মতো না। তারার বুদ্ধি কম।

কাকটা ছেড়ে দিচ্ছ না কেন ? সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরার দরকার কী ?

কাউয়ার উপরে মুহব্বত জন্মাইছে। ছাইড়া দিতে মন চায় না। ছাড়লেও হে যায় না। মুহব্বতের মর্ম পশুপাখিও বুঝে। এই দেখেন ছাড়তাছি। সে যাবে না।

মকবুল খাঁচার দরজা খুলে দিল। কাকটা বের হয়ে এসে মকবুলের চারপাশে গম্ভীর ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আবারো খাঁচায় ঢুকে গেল।

স্যার, আমার জন্যে খাস দিলে দোয়া কইরেন, যেন পিশাচ সাধনা শেষ করতে পারি।

কাক মারতে পারবে ?

উপায় কী! মারতে হবে। যে সাধনার যে নিয়ম। দিল শক্ত করার চেষ্টা নিতাছি। হবে, দিল শক্ত হবে। সময় লাগবে। লাগুক। তাড়াহুড়ার তো কিছু নাই। কী বলেন স্যার ?

খাঁচার ভেতর থেকে কাক আবারো কা কা করে দু'বার ডাকল। মকবুল বিরক্ত গলায় বলল, খাওন তো দিবরে বাপ। তরে খাওন না দিয়া আমি খাব ? তুই আমারে ভাবস কী! চুপ কইরা থাক, স্যারের সাথে মূল্যবান আলাপ করতেছি।

কাক চুপ করে গেল।

আমি তাকিয়ে আছি। অবাক হয়ে এমন একজনকে দেখছি যে হৃদয়ে ভালোবাসার সমুদ্র ধারণ করে পিশাচ হবার সাধনা করে যাচ্ছে।

গন্ধ

'গন্ধ' গল্পটি এক বৈঠকে লেখা। আমার পছন্দের গল্প। আমার ধারণা এই সংকলনের সবচে ভাল গল্প। পাঠক বিবেচনা করুন।

আব্দুল করিম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেল রাত শেষ হলেই তার ফাঁসি হবে। ফাঁসিগুলো সাধারণত ফজরের আজানের আগে আগে হয়। ফাঁসি হয়ে যাবার পর জল্লাদ অজু করে ফজরের নামায পড়ে। সেই হিসেবে আব্দুল করিমের হাতে দশ ঘণ্টা সময় আছে।

জেলার নিজে এসেছেন। সেলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে সিগারেট। তিনি নার্ভাস ভঙ্গিতে সিগারেটে টান দিচ্ছেন। তিনি সরাসরি করিমের চোখের দিকে তাকাচ্ছেনও না।

করিম।

জি স্যার ?

সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে? সিগারেট খাবেন ?

করিম বলল, জি স্যার খাব।

জেলার সিগারেটের প্যাকেট গরাদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, প্যাকেটটা রেখে দিন।

করিম বলল, শুকরিয়া।

রাতে কী খেতে ইচ্ছা করছে বলুন তো ?

করিম বলল, স্যার আজই কি ফাঁসি হবে ?

জেলার সাহেব অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, সেটাতো বলতে পারছি না।

করিম বলল, কী খেতে চাই জানতে চাচ্ছেন এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।

জেলার নিজেকে সামলাতে সামলাতে বললেন, আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে যাদের ফাঁসির হুকুম হয়েছে তাদের কিছু খাওয়াতে ইচ্ছা করে— এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।

আলু ভাজি খেতে ইচ্ছে করছে।

শুধু আলুভাজি ?

জি স্যার! আলুভাজির সঙ্গে শুকনা মরিচ ভাজি আর দুই চামচ গাওয়া ঘি।

মাছ মাংস কিছু না ?

যদি সম্ভব হয় ডিমওয়ালা শিং মাছের ঝোল।

অবশ্যই সম্ভব হবে। কেন সম্ভব হবে না ? কাউকে কিছু কি জানাতে হবে ? আমাকে বলতে পারেন। আমি অবশ্যই জানাব।

কাউকে কিছু জানাতে হবে না স্যার। আপনার অনেক মেহেরবানি।

রাত ন'টার মধ্যে খাবার চলে আসবে।

শুকরিয়া।

জেলার সাহেব চলে গেছেন। সিগারেটের প্যাকেট হাতে আব্দুল করিম মেঝেতে পাতা কম্বলের বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে আছে। সিগারেট সে এখনো ধরায় নি। তার সঙ্গে দেয়াশলাই নেই। ফাঁসির সেলের কয়েদিদের দেয়াশলাই লাইটার রাখতে দেয় না। তবে সিগারেট ধরানো কোনো বিষয় না। গার্ডকে বললেই ধরিয়ে দেবে।

প্যাকেটে সিগারেট আছে আঠারোটা। দশ ঘণ্টার জন্য আঠারোটা সিগারেট। ঘণ্টায় দু'টা করে সিগারেট খাওয়া যাবে। করিম বিছানা থেকে উঠে গরাদ ধরে দাঁড়ালো। গার্ড সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত। ফাঁসির আসামিকে শেষ সময়ে গার্ডরা যথেষ্ট মায়া-মমতা দেখায়।

করিম বলল, একটা সিগারেট ধরাব।

গার্ডের কাছে লাইটার ছিল না, সে দৌড়ে কোত্থেকে লাইটার নিয়ে এল। করিম বলল, বাংলা মাস কী জানেন ?

অগ্রহায়ণ মাস।

করিম সিগারেটে টান দিল। গ্রামের দিকে অগ্রহায়ণ মাসে তীব্র শীত পড়ে। কাঁথায় মানে না এমন শীত। অথচ ঢাকা শহরে শীত নেই। জেলখানায় শীত আরো কম। দেড় বছরের উপরে সে জেল হাজতে আছে। শীতকাল বলে যে একটা ঋতু আছে বুঝতেই পারে নি। জেলাখানায় একটাই ঋতু— গরম কাল।

গার্ড বলল, পান খাবেন ? একটা পান এনে দেই ?

করিম বলল, এখন পান খাব না। ভাত খাওয়ার পরে একটা খাব।

গার্ড বলল, কোনো চিন্তা নাই। জর্দা দিয়ে ডাবল পান এনে দিব।

করিম বলল, শুকরিয়া।

শুকরিয়া বলা সে শিখেছে যমুনার কাছ থেকে। মুন্‌সি মাওলানারা কথায় কথায় শুকরিয়া বলে। তার স্ত্রী যমুনা কোনো মুন্‌সি মাওলানা বা মাওলানা ঘরের মেয়েও না। কার কাছ থেকে সে শুকরিয়া বলা শিখেছিল কে জানে! একদিন করিম জিজ্ঞাসা করেছিল। যমুনা অন্যদিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল— 'বলব না'।

বলব না বলাও তার আরেক রোগ। কিছু জানতে চাইলেই বলতো— 'বলব না'।

একদিন দুপুরে বাসায় খেতে বসে দেখে এলাহি আয়োজন। পোলাও, কোর্মা, খাসির রেজালা। অথচ ছুটির দিন বলে সে সকালে নিজেই বাজার করেছে— টেংরা মাছ, কচুর লতি এবং ছোট চিংড়ি। করিম বিস্মিত হয়ে বলল, ব্যাপার কী?

যমুনা যথারীতি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, বলব না। ঘটনা কী রাতে জানা গেল। তাদের বিয়ের দিন। করিম বিয়ের প্রথম বছরেই এই দিনটা ভুলে গেল। আফসোস।

তাদের বিয়ে হয়েছিল পৌষ মাসে। নেত্রকোনার পৌষ মাসের শীত যে কী জিনিস যারা সেই সময় নেত্রকোনায় যাবে না তারা কোনোদিনই জানবে না। মেয়ের বাড়িতেই বাসর হলো। ফুল দিয়ে সাজানো পুরনো আমলের খাট। আয়োজনের কোনো কমতি নেই। সমস্যা একটাই, গায়ে দেবার জন্যে পাতলা ফুল তোলা একটা কাঁথা ছাড়া কিছু নেই। যে দেশে ডাবল লেপে শীত মানে না সেই দেশে নতুন জামাইকে দেয়া হয়েছে পাতলা একটা কাঁথা।

করিম নববধূকে বলল, তোমাদের বাড়িতে লেপ নেই?

যমুনা বলল, অবশ্যই আছে। বাপজানে বিয়ার জন্যে শিমুল তুলার নয়া ডাবল লেপ বানাইছে।

তাহলে কাঁথা কেন?

যমুনা অন্যদিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, বলব না।

কাঁথার রহস্য জানা গেল অনেক দিন পর। পুরো ব্যাপারটা করেছেন যমুনার দাদিজান। তিনি নাতিন জামাই-এর সঙ্গে সামান্য মশকরা করেছেন।

বিয়ের প্রথম রাতে যে পুরুষের শীত লাগে সে না-কি পুরুষের জাতই না। যমুনার দাদিজান পরীক্ষা করে দেখেছেন করিম পুরুষের জাতে পড়ে কি-না। পরীক্ষায় করিম পাস করতে পারে নি। শেষ রাতে যমুনাকে লেপ আনতে বাড়ির ভেতর যেতে হয়েছিল। করিম কাঁথা গায়ে দিয়ে থরথর করে কাঁপছে এই দৃশ্য যমুনা মেনে নিতে পারে নি।

আজ রাত শেষ হবার আগেই করিমের ফাঁসি হবে তার স্ত্রীকে গলা টিপে খুন করার জন্য। অথচ খুনটা সে করে নাই। ঐদিন দুপুরে তার প্রচণ্ড মাথা ধরল। কপালে হাত দিয়ে মনে হল জ্বর আসছে। অফিস কামাই দেয়া তার স্বভাব না। জ্বর নিয়েই সে অপেক্ষা করতে লাগল কখন চারটা বাজবে। এই সময় বাড়িওয়ালার বাসা থেকে তার কাছে একটা টেলিফোন এল। বড় সাহেবের চেম্বারে গিয়ে টেলিফোন ধরতে হল। করিমের খুবই সংকোচ লাগছিল কারণ তার টেলিফোনে কর্মচারীদের কল এলে তিনি খুব রাগ করেন। ভাগ্য ভালো সেদিন বড় সাহেব অফিসে ছিলেন না। যমুনা টেলিফোনে ভীত গলায় বলল, এক্ষুণি বাসায় আসতে পারবে ?

করিম বলল, কেন ?

যমুন বলল, বলব না। এক্ষুণি বাসায় আস।

কোনো সমস্যা ?

বলব না।

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে করিম রিকশা করে বাড়ি ফিরল। তার বাসা চারতলার তিন কামরায় একটা ফ্লাটে, সে আর যমুনা থাকে। বারো-তের বছরের একটা কাজের মেয়েও থাকে। মেয়েটার নাম জাহেদা। করিমের শাশুড়ির নাম জাহেদা হবার কারণে মেয়েটাকে ডাকা হতো ফুলি।

করিম সিঁড়ি থেকে চারতলায় উঠল। অনেক্ষণ কলিংবেল টিপল। কেউ দরজা খুলল না। সবসময় একবার কলিং বেল টিপলেই যমুনা ছুটে এসে দরজা খোলে।

করিম দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখে দরজা খোলা। সে ঘরে ঢুকল। শোবার ঘরে চাদর মুড়ি দিয়ে যমুনা ঘুমিয়ে আছে। তার ঠোঁটে রক্ত জমে কালো হয়ে আছে। কিছুক্ষণ সে হতভম্বের মত যমুনার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর অতি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামল। দারোয়ান গেট খুলে দিল। সে দৌড়ে চলে গেল রাস্তায়।

কোর্টে উকিল সাহেব তাকে অস্থির করে তুলছেন। উকিল সাহেব হালকা পাতলা মানুষ। গায়ের রং গাউনের মতোই কালো। তাঁর দাঁত এবং চোখের সাদা অংশ অস্বাভাবিক সাদা। সব সময় ঝনঝন করছে। তাঁর চোখে চশমা কিন্তু প্রশ্ন করার সময় চশমাটা হাতে নিয়ে নেন। চশমার ডাঁট আঙুলের মতো তুলে প্রশ্ন করেন। বেশির ভাগ প্রশ্নেরই কোনো আগামাথা নেই।

আপনার বাসার কাজের মেয়েটির বয়স কত ?

বারো তের হবে। সঠিক জানি না।

তার সঙ্গে আপনার যৌন সম্পর্ক কত দিনের ?

ছিঃ জনাব। মেয়েটা আমাকে চাচা ডাকে।

এ দেশে প্রচুর চাচা আছে যারা নিকট এবং দূরের ভাতিজিদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে। করে না ?

জনাব আমি জানি না।

আপনাদের এই যৌন সম্পর্কের বিষয়টি আপনার স্ত্রী কখন জানতে পারেন ?

এই জাতীয় কোনো কিছুই হয় নাই।

আপনার স্ত্রী অকারণেই আপনাকে সন্দেহ করতেন।

আমার বিষয়ে কখনোই তার কোনো সন্দেহ ছিল না।

ঘটনার আগের দিন আপনি কাজের মেয়েটিকে ছুটি দেন। সেটা কি হত্যাকাণ্ড ঘটানোর সুবিধা হয় এই কারণে?

মেয়েটার বাবা অসুস্থ। সে দেশের বাড়িতে যাবে এই কারণে ছুটি চেয়েছিল। আমার স্ত্রী তাকে ছুটি দিয়েছিলেন। আমি না।

উকিল সাহেব বললেন, আপনার স্ত্রীকে আদালতে এনে জিজ্ঞাসা করা যাবে না যে ছুটি কে দিয়েছে। এটাই সমস্যা। সমস্যা না ?

জি জনাব।

উকিল সাহেব এই পর্যায়ে জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, পুলিশ জাহেদা নামের মেয়েটাকে শ্যামগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করেছে। সে বলেছে সে কখনো ছুটি চায় নাই। তাকে হঠাৎ ছুটি দেয়া হয়। মেয়েটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে যে আসামির সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক ছিল। আমরা যথাসময়ে মেয়েটিকে উপস্থিত করবো। এখন আমরা আসামির কাছে ফিরে যাই।

আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনি ঘরে ঢুকে দেখেন যে আপনার স্ত্রী খুন হয়েছে ?

জি।

এত বড় একটা ঘটনা ঘটার পর আপনার উচিত ছিল প্রতিবেশীদের জানানো। তা না করে আপনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন। রাত তিনটায় পুলিশ আপনাকে কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করে। এটা কি সত্যি ?

জি সত্যি।

তখনো আপনার হাতে রক্তের দাগ লেগেছিল এটা কি সত্যি ?

জি সত্যি। যমুনার ঠোঁটে রক্ত ছিল সেই রক্ত হাতে লেগে গিয়েছিল।

আপনার বাসা থেকে কোনো কিছুই খোয়া যায় নাই এটা কি সত্যি ?

জি সত্যি।

তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ডাকাতির উদ্দেশ্যে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয় নাই। আমার যুক্তি ঠিক আছে ?

জি।

আপানার স্ত্রী যমুনার পোস্টমর্টেম করা হয়েছে। হত্যার আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল এমন আলামত পাওয়া যায় নি। হত্যাকারী টাকা-পায়সার লোভেও হত্যা করে নি আবার ধর্ষণের জন্যও হত্যা করে নি। তার মোটিভ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। যাই হোক হত্যাকাণ্ডের পর আপনি কমলাপুর রেলস্টেশনে বসে ছিলেন কেন ?

জানি না।

কেন জানবেন না ? আপনার পকেটে বাহাদুরাবাদ ঘাটের একটা টিকিট পাওয়া গেছে। টিকিট কাটা হয়েছে ময়মনসিংহ পর্যন্ত। আমি ভুল বলছি ?

জি না জনাব।

আপনি কি পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন ?

জি না জনাব।

তাহলে ময়মনসিংহের টিকিট কেন কেটেছিলেন ? রিলাক্স করতে যাবার জন্য ?

উকিল সাহেবের কথায় করিম আহত হয়েছে কিন্তু রাগ করে নি। মনে কষ্ট পায় নি। উনি উনার কাজ করবেন। অপরাধী ধরবেন। তার যেন কঠিন শাস্তি হয় সেই ব্যবস্থা করবেন। এই কারণেই তাকে টাকা দিয়ে রাখা হয়েছে। করিম মনে কষ্ট পেয়েছে জাহেদার কথায়। মেয়েটারে এত স্নেহ করতেন। মা ডাকতেন। এই নিয়ে যমুনা রাগ করতো।

কাজের মেয়েকে মা ডাকো কেন ? নাম ধরে ডাকো। বেশি আদর করলে এরা মাথায় উঠে।

বাচ্চা মেয়ে, কত কাজ করে। মেয়েটাকে স্নেহ করি।

সেই মেয়ে এজলাসে উঠে এটা কী করল! লজ্জায় করিমের মাথা কাটা যাওয়ার মতো অবস্থা।

তুমি উনাকে চেন ?

চিনি।

উনার নাম বলো।

আব্দুল করিম।

উনার বাসায় তুমি কত দিন ধরে আছ ?

এক বছর।

তোমাকে নিয়ে উনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হতো ?

হুঁ।

হুঁ না। পরিষ্কার করে বলো। প্রায়ই ঝগড়া হতো ?

জি হইত।

উনার স্ত্রী সন্দেহ করতো যে উনার সঙ্গে তোমার খারাপ সম্পর্ক আছে ?

হুঁ।

করিমের উকিল এই পর্যায়ে বললেন, জেরা ঠিক হচ্ছে না। সাক্ষীর মুখে তুলে দেয়া হচ্ছে।

তার উত্তর উকিল সাহেব বললেন, কিছু কিছু কথা মুখে তুলে দিতে হবে। বাচ্চা একটা মেয়ে নিজ থেকে গড়গড় করে নোংরা কথা বলতে পারে না।

করিমের মুখ ইচ্ছা করছিল মেয়েটাকে বলে, মাগো এই মিথ্যা কথাগুলো তুমি কেন বলছ? জিজ্ঞাস করা হয় নি। লজ্জাতেই জিজ্ঞাস করতে পারে নি। মেয়েটার মিথ্যা বলার একটা কারণ করিম অনেক পরে বের করেছে। মেয়েটার ধারণা করিম যমুনাকে খুন করেছে। মেয়েটা চাচ্ছে করিমের কঠিন শাস্তি হোক।

রাত ন'টা। জেলার সাহেবের বাসা থেকে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার এসেছে। করিম যা যা বলেছে সবই এসেছে। করিম আগ্রহ করে খেতে বসল। আলুভাজি, ডিওয়ালা শিং মাছ তার পছন্দের খাবার তা কিন্তু না। যমুনার পছন্দের খাবার। সে তাকে বলেছে বেহেশতে সে আল্লাহ পাকের কাছে এই খাবারই দুই বেলা খেতে চাইবে।

করিম বলেছিল, বেহেশতে তুমি আলুভাজি পেতে পার, শিং মাছের ঝোল পাবে না।

যমুনা বলল, কেন পাব না ?

করিম বলল, শিং মাছের প্রাণ আছে। শিং মাছের ঝোল রাঁধতে হলে শিং মাছের প্রাণ নষ্ট করতে হবে। বেহেশতের মতো জায়গায় কোনো প্রাণ নষ্ট করা যাবে না।

তোমাকে কে বলেছে ?

কেউ বলে নাই। আমি চিন্তা করে বের করেছি।

যমুনা মুগ্ধ গলায় বলল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তোমার কথা ঠিক। কাজেই শিং মাছ যা খাবার আমি দুনিয়াতেই খেয়ে যাব। সপ্তাহে

Doridro.com

একদিন অবশ্যই আমার জন্য শিং মাছ কিনে আনবে।

গার্ড জর্দা দিয়ে পান নিয়ে এসেছে। পানটা খেতে করিমের খুবই ভালো লাগল। সে নিজেই একটা সিগারেট ধরালো, গার্ডকে একটা দিল। গার্ড বলল, ভাই সাহেব মনে সাহস রাখবেন।

করিম বলল, রাখব। সাহস রাখার চেষ্টা করব। পারব কিনা জানি না। আচ্ছা ভাই আমাকে যে ফাঁসি দিবে তার নাম কী?

গার্ড বলল, দুই ভাই আছে। যাবজ্জীবন হয়েছে। তারাই ফাঁসি দেয়। এক ভাইয়ের নাম রমজান। আরেক ভাইয়ের নাম আলী। দুই ভাই-ই এখানে আছে। কে ফাঁসি দিবে জানি না।

কে ফাঁসি দিবে জানলে ভালো হতো।

কেন?

একজন নিরপরাধ মানুষের ফাঁসি দেয়ার কারণে তার কিছু পাপ হবে। সেই পাপ যেন না হয় তার জন্যে দোয়া করা দরকার। সে তো আর জানে না আমি নির্দোষ।

গার্ড বলল, ফাঁসির সব আসামি বলে সে নির্দোষ। যখন ফাঁসি দেবার জন্যে কালো টুপি দিয়ে তার মুখ ঢেকে দেয় তখনি সে বুঝে যে নির্দোষ না। অনেকেই চিৎকার করে বলে আমি দোষ করেছি আল্লাহপাক ক্ষমা করো। আপনি কি আরেকটা পান খাবেন, এনে দিব?

দেন, আপনার অনেক মেহেরবানি।

কোরান মজিদ পড়বেন?

আরবি পড়তে পারি না।

সিগারেট আছে, আর লাগবে না। সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসও আমার নাই। জেলার সাহেব দিয়েছেন বলে খাচ্ছি।

দ্বিতীয় পানে জর্দা বেশি ছিল। খাওয়ার পর করিমের মাথা ঘুরাতে লাগলো। কাঁচা সুপারির পান খেয়ে যমুনার একবার এরকম হল। মাথা ঘুরে বিছানায় পড়ে গেল। ঘামে শরীর গেল ভিজে। যমুনা বলল, এই শোন আমি মারা যাচ্ছি। তুমি আমার হাত ধরে বসে থাকো। তুমি নড়বা না। খবরদার নড়বা না। আহারে কী ছেলেমানুষী! মানুষ কি এত সহজে মরে? মানুষের মৃত্যু কঠিন ব্যাপার। অনেক আয়োজন লাগে। ভোরবেলায় তার মৃত্যু হবে। অনেক আয়োজন লাগবে, অনেক চিন্তার বিষয়ও আছে।

করিম রাত এগারোটার দিকে কম্বলে ঘুমাতে গেল। সে জানে ঘুম আসবে না। তার পরেও সময়টাতো পার করতে হবে। যমুনার কথা চিন্তা করলে সময়টা সুন্দর পার হয়ে যাবে। চিন্তা করার কত কিছু আছে। কত ঘটনা। একবার সে যমুনাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে, হঠাৎ শোনে রাগ করে সে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কী কারণে রাগ করেছে তা জানা যাচ্ছে না। দুপুরে সে কিছু খেল না। রাতেও না। যমুনার মা শুরু করলেন কান্না। এতদিন পরে মেয়ে এসেছে। খাওয়া-দাওয়ার কত আয়োজন অথচ মেয়ে উপোস। তিনি বারবার বলছেন, মারে আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। মানুষ ভুল করে না ? তামাশা করে একটা কথা বললাম। মাফ করে দে মা।

যমুনা ঘাড় শক্ত করে বলল, মাফ করব না। কাল সকালে আমি চলে যাব। লোকজনের অনুরোধ, চোখের পানি কিছুই কাজ করল না।

রাগের ঘটনা করিম জেনেছে অনেক দিন পর। তাঁর শাশুড়ি না-কি বলেছিলেন, যমুনার জামাইটা বোকা কিসিমের।

এটা রাগ করার কোনো বিষয় ? সে বোকা এটাতো সত্যি। শাশুড়ি আম্মা একটা সত্যি কথা বলছিলেন। এই নিয়ে কোন মেয়ে এত রাগ করে ?

করিম ভেবেছিল তার ঘুম আসবে না। বিছানায় শোয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর গাঢ় ঘুম। ঘুম ভাঙল জেলখানার মাওলানা সাহেব যখন ডেকে তুললেন। তাকে গোসল দেয়া হবে। তওবা পড়ানো হবে। মাওলানা সাহেব জেলখানায় পরিষ্কার পায়জামা ফতুয়া নিয়ে এসেছেন। এই কাপড় পরেই তার যাত্রা। করিম বলল, মাওলানা সাহেব একটা প্রশ্ন ছিল।

বলেন কী প্রশ্ন ?

বেহেশতে কি শিং মাছের ঝোল পাওয়া যাবে ?

মাওলানা প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হলেন না। ফাঁসির আসামি তওবা পড়ানোর আগে অনেক উদ্ভট উদ্ভট কথা বলে। মাওলানা বললেন, বেহেশতে মানুষ যে খানাই খেতে চাবে তাই দেয়া হবে। সেই খানার স্বাদ হবে পৃথিবীর খানার স্বাদের চেয়েও এক হাজার গুণ বেশি। বলেন সোবাহানাল্লাহ।

করিম বলল, সোবাহানাল্লাহ।

করিমকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দু'জন পুলিশ দুদিক থেকে তাকে ধরে রেখেছে। তার হাত পেছন দিকে বাঁধা। তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। করিম কোনো হৈচৈ করছে না। অনেকেই করে ছুটে পালিয়ে যেতে চায়। জেলার সাহেব তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছেন। করিম তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার যে আমার ফাঁসি দিবে তার নামটা কী বলবেন।

কী হবে নাম জেনে ?

কৌতূহল আর কিছু না।

তার নাম রমজান। রমজান মিয়া।

নামটা বলার জন্যে স্যার শুকরিয়া।

করিমের মনে পড়ল তার ফ্ল্যাট বাড়ির দারোয়ানের নামও রমজান মিয়া। অতি বিনয়ী। বিশাল শরীর সেই তুলনায় মাথাটা ছোট। কথা বলতো মাটির দিকে তাকিয়ে। হাতের বিড়ি অদ্ভুত কায়দায় লুকিয়ে ফেলত। সবার সঙ্গে দু'একটা কথা সে বলতই— স্যার ভালো আছেন ? কী বাজার করছেন ? ইলিশ মাছ ? দাম কত নিল ? মাছ আর খাওয়া যাবে না। খানা খাদ্য দেশ থাইকা উইঠ্যা যাবে। মাটি খায়া থাকতে হবে।

করিম ভেবে পেল না এত মানুষ থাকতে মৃত্যুর আগে আগে রমজান মিয়ার কথা তার মনে পড়ছে কেন ?

কাঠের পাটাতনে করিমকে দাঁড়া করানো হয়েছে। মচমচ শব্দ হচ্ছে। শব্দটা অদ্ভুত লাগছে। কেন অদ্ভুত লাগছে এটাও সে বুঝতে পারছে না। করিমের মাথায় কালো টুপি পরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে যমুনার রহস্য ভেদ করল।

দারোয়ান রমজান মিয়া সব সময় তার সঙ্গে অনেক কথা বলে কিন্তু যমুনার মৃত্যুর দিন সে পাগলের মতো ছুটে বের হচ্ছে, রমজান মিয়া গেট খুলে দিল একটা কথাও বলল না।

যমুনা বলছিল, এই শোন ফুলিকে আমি রাখব না। বিদায় করে দেব। ও প্রায়ই দারোয়ানটার সঙ্গে গল্প করতে চায়।

করিম বলেছিল, থাক না। রমজান মিয়াইতো দেশের বাড়ি থেকে মেয়েটাকে এনে দিয়েছে। তার আপনা লোক। ফুলি দারোয়ানের কাছ থেকে যখন ফিরে তখন তার গায়ে থাকে বিড়ির গন্ধ।

করিম যমুনার গায়ের উপর থেকে যখন চাদর সরিয়েছিল তখন কড়া বিড়ির গন্ধ পেয়েছিল। রমজানের হাতের বিড়ির গন্ধ লেগেছিল যমুনার গায়ে। কত সহজ সমাধান।

করিম বিড়ির গন্ধ আবার পাচ্ছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যমুনার চুলের মিষ্টি গন্ধটা মনে করতে। মৃত্যুর সময় যমুনার চুলের মায়াবী গন্ধটা একবার যদি মনে পড়ত! বিড়ির উৎকট গন্ধ সব এলোমেলো করে দিচ্ছে।

জেলার সাহেব হাতের ইশারায় ফাঁসি কার্যকর করার সিগনাল দিলেন।

জনৈক আব্দুল মজিদ

আমার তিন মেয়েরই তাদের লেখক বাবার লেখা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ছিল। এদের একজন (শীলা আহমেদ) ক্লাস ফাইভ সিক্সে পড়ার সময় বলতো— "সব লেখকদের লেখা স্কুলে পাঠ্য হয় বাবারটা কেন যে হয় না।"

'জনৈক আব্দুল মজিদ' লেখাটি ইন্টারমিডিয়েট বাংলা সিলেকশনে পাঠ্য হয়েছে। আমার তিন মেয়ের কাউকেই এই লেখা পড়তে হয় নি, কারণ তারা পড়াশোনা শেষ করে ফেলেছে।

তবে এই লেখাটা পাঠ্য না হলেই ভাল হত। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে ফরমায়েসী এক তাড়াহুড়ার লেখা। গল্প বলা বা গল্প নির্মাণের আনন্দ অনুপস্থিত, প্রবন্ধের মুক্ত যুক্তির প্রান্তরও নেই। কি আর করা।

প্রায় এক যুগ আগের কথা (১৯৯৪), আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মানুষদের জন্যে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করবে। বিষয় এইডস। জনসচেতনামূলক ছবি। ডকুমেন্টারি তৈরির দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। আমি গভীর জলে পড়লাম। এইডস বিষয়ে আমার জ্ঞান শূন্যের কাছাকাছি। শুধু জানি এটি একটি ভাইরাসঘটিত ব্যাধি। যে ভাইরাস থেকে রোগটা হয় তার নাম Human Immunodoficiency ভাইরাস। সংক্ষেপে HIV. ঘাতক ব্যাধি। ওষুধ আবিষ্কার হয় নি। এইডস হওয়া মানেই মৃত্যু।

শূন্যজ্ঞান নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরিতে হাত দেয়া যায় না। বিষয়টা ভালোমতো জানা দরকার। একজন AIDS-এর রোগীকে খুব কাছ থেকে দেখা দরকার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সিলেটের এক গ্রামে একজন এইডস রোগীর দেখা সন্ধান পাওয়া গেল। ধরা যাক তার নাম আব্দুল মজিদ। সে কাজ করত ইন্দোনেশিয়ায়। ঘাতক ব্যাধি সে বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে।

তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা বিরাট হৈচৈ শুরু করল, আব্দুল মজিদের এইডস হয় নি। সবই দুষ্ট লোকের রটনা। আব্দুল মজিদ নেক ব্যক্তি। আদর্শ জীবন যাপন করেন— ইত্যাদি।

আমার লেখক পরিচিতির কারণেই হয়তোবা রোগীর দেখা পাওয়া গেল। ছোট্ট একটা ঘরে কঙ্কালসার একজন মানুষ শীতলপাটিতে শুয়ে আছে। একটু পর পর সে হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ঠোঁটের কাছে কয়েকটা মাছি বসে আছে। হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ক্ষমতাও মানুষটির নেই। তার চোখ যক্ষ্মারোগীর চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে। সে প্রতীক্ষা করছে মৃত্যুর। বেচারাকে দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। নিজের অজান্তেই তার কপালে হাত রাখলাম। সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

সে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, তার এইডস হয়েছে এটা সত্যি। সে কিছুদিনের মধ্যে মারা যাবে এটাও সত্যি। তার একমাত্র দুঃখ কেউ তার কাছে আসে না। তার স্ত্রী দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। কেউ তার ঘরে পর্যন্ত ঢোকে না। তাকে খাবার দেয়া হয় জানালা দিয়ে। তার ঘরের একটা মাত্র জানালা, সেটাও থাকে বন্ধ। অথচ সে পরিবারের জন্যে কত কিছুই না করেছে।

আমি তাকে বললাম, ভাই রোগটা বাঁধালেন কীভাবে?

সে মাথা নিচু করে বলল, বিদেশ থেকে নিয়ে আসছি। খারাপ মেয়েমানুষের সাথে যোগাযোগ ছিল। আমার পাপের শাস্তি।

পৃথিবীতে অনেক ব্যাধিকেই পাপের শাস্তি কিংবা ঈশ্বরের অভিশাপ হিসেবে দেখা হয়েছে। যেমন— কুষ্ঠ রোগ। AIDS-এর কপালে পাপের শাস্তির সীল ভালোমতো পড়েছে কারণ সম্ভবত এই রোগের সঙ্গে অসংযত যৌনতার সরাসরি সম্পৃক্ততা।

এই রোগ প্রথম ধরা পড়ে সমকামীদের মধ্যে (১৯৮১ সন, নিউইয়র্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়া)। শুরুতে গবেষকরা ধারণা করেছিলেন, এই রোগের প্রধান কারণ সমকামিতা। এই ধারণা এখন আর নেই। ১৯৮৩ সনে ফরাসি গবেষক লকু মনটরগনিয়ার এবং ১৯৮৭ সনে আমেরিকার রবার্ট গ্যালো আবিষ্কার করেন ভাইরাসঘটিত এজেন্ট HIV টাইপ ওয়ান থেকে এইডস ব্যাধির সৃষ্টি। পশ্চিম আফ্রিকার এইডস রোগীদের পরীক্ষা করে HIV টাইপ টু বের করা হয়। এইচআইভির'র প্রধান কাজ, মানুষের শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া। টাইপ ওয়ান এই কাজটি করে দ্রুত,

টাইপ টু ভাইরাস কাজ করে ধীরে। রোগের লক্ষণ জটিল কিছু না—দুর্বলতা, জ্বর, ডায়েরিয়া, লসিকা গ্রন্থির ফুলে যাওয়া। এই অতি সাধারণ লক্ষণের অসুখ এক সময় সংহারক মূর্তি ধারণ করে।

এই কালান্তক ব্যাধির ভয়াবহতার কারণেই জাতিসংঘে গঠিত হয়েছে এইডস বিষয়ক সংস্থা (UNAIDS)। পহেলা ডিসেম্বরকে বিশ্ব এইডস দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। জাতিসংঘের এইডস বিষয়ক সংস্থার পরিসংখ্যান দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। ২০০৫ সনের হিসেবে এইচআইভি সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা ছিল চার কোটির বেশি। বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিদিন ১৪ হাজার মানুষ এইচআইভি'তে আক্রান্ত হচ্ছে। সাহারা মরুভূমির চারপাশের আটচল্লিশটি দেশে এখন মৃত্যুর প্রধান কারণ এইডস। অনেক দেশেই এই মরণব্যাধি মানুষের গড় আয়ু দশ বছর কমিয়ে দিয়েছে। ভারত, নেপাল, বার্মা, চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যাণ্ডে এইডস দ্রুত ছড়াচ্ছে।

সেই তুলনায় আমরা এখনো ভালো আছি। ঘোড়া এখনো লাগাম ছাড়া হয় নি। UNAIDS-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা ১৩৪, এইডস থেকে মৃত্যুর সংখ্যা ৭৪, এইচআইভি পজেটিভ মানুষের সংখ্যা ৬৫৮। এই পরিসংখ্যানে আনন্দে উল্লসিত হবার কিছু নেই। পাগলা ঘোড়া যে-কোনো সময় লাগামছাড়া হতে পারে। কীভাবে পারে তা ব্যাখ্যা করার আগে এইডস কীভাবে ছড়ায় সে সম্পর্কে একটু বলে নিই।

মানুষের শরীরে এইচআইভি ভাইরাস কোথায় থাকে? তার অবস্থান তিন জাতীয় তরল পদার্থে। রক্তে, বীর্যে এবং মায়ের দুধে। কাজেই রোগ ছড়াবে তিন জাতীয় তরলের আদান-প্রদানে।

ক. এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে অনিরাপদ যৌন মিলনে। অনিরাপদ যৌন মিলনের অর্থ কনডমবিহীন যৌন মিলনে। লিখতে অস্বস্তি লাগছে কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে স্পেডকে স্পেড বলাই বাঞ্ছনীয়।

খ. রক্ত আদান-প্রদান। এইচএইভি আক্রান্ত রোগীর রক্ত শরীরে নেয়া।

গ. শিশুদের এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের দুধ পান।

বাংলাদেশ শিক্ষায় অনগ্রসর হতদরিদ্র একটি দেশ। পতিতাবৃত্তি দরিদ্র দেশের অনেক অভিশাপের একটি। যৌনকর্মীরা (নারী এবং পুরুষ) নগরে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শিক্ষিত আধুনিক তরুণ-তরুণীদের মধ্যে নৈতিকতা অনুশাসন তেমনভাবে কাজ করছে না। অবাধ মেলামেশাকে তারা

অনেকেই আধুনিকতার অংশ মনে করছে। তথাকথিত এই আধুনিকতার কারণে তারা যে কত বড় ঝুঁকির মধ্যে আছে তা তারা বুঝতেও পারছে না।

বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে আছে এ দেশের মেয়েরা। তাদের যৌন শিক্ষা নেই বললেই হয়। মূল কারণ যৌনতা-বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারই এ দেশে ট্যাবু। সমাজের মেয়েদের অবস্থান দুর্বল। অনিরাপদ যৌন সম্পর্কে বাধা দেবার ক্ষমতাও এদের নেই।

আমাদের পাশের দেশগুলোতে এইডস রোগ বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। এইসব দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। আনন্দ-পিপাসুরা সেসব দেশে যাচ্ছেন। ভিনদেশের যৌনকর্মীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হচ্ছে। তারা দেশে ফিরছেন এইচআইভি ভাইরাস নিয়ে। নিজেরা কিন্তু চট করে সেটা বুঝতে পারছে না। কারণ এইচআইভি মানুষের শরীরে দীর্ঘদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দশ বছর এইচআইভি থাকবে ঘুমন্ত। এইচআইভি ঘুমন্ত থাকলেও তারা তো ঘুমন্ত না। তারা মহানন্দে তাদের শরীরের এইচআইভি ছড়িয়ে বেড়াবেন। জাতি অগ্রসর হবে ভবিষ্যতহীন অন্ধকারের দিকে।

বাংলাদেশে মাদক গ্রহণের সংখ্যাও আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। হিরোইন আসক্তরা সুঁচ দিয়ে শরীরে বিষ ঢোকাচ্ছে। একই সুই অন্যরাও ব্যবহার করছে। এইচআইভি ভাইরাস ছড়ানোর কী সুন্দর সুযোগ!

এই দেশের কিছু অসহায় মানুষ বেঁচে থাকেন শরীরের রক্ত বিক্রি করে। তাদের কারোর এইচআইভি পজিটিভ রক্ত যখন অন্য কাউকে দেয়া হবে তখন অবস্থাটা কী? অনেক উন্নত দেশেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। দূষিত রক্ত মিশে গেছে ব্লাড ব্যাংকের রক্তে।

সিলেটের এইডস রোগীর কাছে ফিরে যাই। আমি রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে বুঝালাম যে এই রোগ অন্যান্য ছোঁয়াচে রোগের মতো না। স্বাভাবিক মেলামেশায় এই রোগ ছড়াবে না। এইডস রোগী যে গ্লাসে পানি খাচ্ছে সেই গ্লাসে অন্য কেউ যদি পানি খায় তাতেও তার রোগ হবে না। আমার কথায় তেমন কাজ হলো বলে মনে হলো না। তারা রোগীর দিকে ঘৃণা এবং ভয় নিয়ে তাকিয়ে রইল।

পশু-পাখিদের মধ্যে কেউ যদি রোগগ্রস্থ হয় তখন অন্যরা তাদের ত্যাগ করে। রোগীকে মরতে হয় সঙ্গীবিহীন অবস্থায় একা একা। মানুষ তো

পশুপাখি না। মানুষ রোগীকে দেখবে পরম আদরে এবং মমতায়। রোগকে ঘৃণা করা যায়, রোগীকে কেন?

আমি এইডস রোগী আব্দুল মজিদকে (আসল নাম না, নকল নাম) বললাম, ভাই আমি AIDS নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি বানাব। আপনি কি সেখানে কাজ করবেন?

আব্দুল মজিদ ক্লান্ত গলায় বলল, আমার লাভ কী? আমি তো মরেই যাব।

আমি বললাম, আপনার লাভ হলো, ডকুমেন্টারি দেখে বাংলাদেশের মানুষ সাবধান হবে।

আব্দুল মজিদ রাজি হলেন। তবে শেষ পর্যন্ত কাজ করতে পারলেন না। আমি সিলেট থেকে ফিরে চিত্রনাট্য তৈরি করার পরপরই শুনলাম তিনি মারা গেছেন।

হিমুর একান্ত সাক্ষাৎকার

আয়োজন করে গল্প লিখতে বসেছি। এক বৈঠকে গল্প শেষ করব এই কারণেই আয়োজন। বল পয়েন্টের প্যাকেট, কাগজ, চায়ের কাপ, সিগারেটের প্যাকেট হাতের কাছে। বল পয়েন্টের প্যাকেট নিয়ে বসেছি কারণ কলমগুলো এমন যে সামান্য লিখলেই কালি আটকে আসে। আমার স্বভাব যে কলমে একবার কালি আটকালে সে কলম দূরে ছুঁড়ে ফেলা। লেখার কাগজের ব্যাপারেও আমার কিছু সৌখিনতা আছে। খুব দামী কাগজে লিখতে পছন্দ করি। যখন হত দরিদ্র অবস্থা ছিল তখনো রেডিও বণ্ড নামের কাগজ ব্যবহার করতাম। অমৃত ধারণ করতে হয় স্বর্ণভাণ্ডে, মাটির হাঁড়িতে না। লেখা আমার কাছে 'অমৃতসম'।

এক বৈঠকে লেখা শেষ করতে হবে। কারণ সন্ধ্যাবেলা লেখা নিতে পত্রিকার অফিস থেকে লোক আসবে। আজই শেষ দিন। ঈদ সংখ্যায় আমার গল্প যাচ্ছে এ রকম বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে।

আয়োজন করে বসার কারণেই দুপুর পর্যন্ত একটা লাইন লেখা হল না। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম— মাথায় কোনো গল্প নেই। গল্প দূরের কথা কোনো চরিত্র পর্যন্ত নেই। চারটা পাতা নষ্ট করেছি প্রতিটিতে একটা শব্দ লেখা 'আম'। এত কিছু থাকতে আম কেন লিখেছি তাও বুঝতে পারছি না। রাজশাহী থেকে আমার কাছে একজন এক ঝুড়ি আম পাঠিয়েছে এটাই কি কারণ ?

দুপুরে ভাত খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে কি মাথায় গল্প আসবে ? আসতেও পারে। তাই করলাম। খেয়ে দেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুম। ঘুম ভাঙ্গল সন্ধ্যার পর। জেগে উঠে শুনি গল্প নেবার জন্যে লোক এসেছে। তাকে বসিয়ে রেখেই লেখা শুরু করলাম। 'আম'-কে করলাম আমরা। প্রথম বাক্য– "আমরা পাঠকদের কথা দিয়েছিলাম ঈদ সংখ্যায়..."

লেখা যা দাঁড়াল তাকে আর যাই বলা যাক গল্প নিশ্চয়ই বলা যাবে না তবে ঈদ সংখ্যা যুগান্তরে গল্প হিসেবেই ছাপা হয়েছে। পাঠকরা চমকে উঠবেন কুড়ি বছর আগে আমি একটি কবিতার বইয়ের সমালোচনা লিখে সাপ্তাহিক রোববারে পাঠিয়েছিলাম। সেখানেও সমালোচনাটা ছাপা হয়েছে গল্প হিসেবে।

আমরা পাঠকদের কথা দিয়েছিলাম ঈদ সংখ্যায় হিমু এবং মিসির আলি সাহেবের একান্ত সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হবে। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মিসির আলি অসুস্থ হয়ে বক্ষব্যাধি হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। তার অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল, তবে তিনি এখন ভালো আছেন। তারপরেও তার চিকিৎসকরা তাকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলছেন। তার কোনো সাক্ষাৎকার এ কারণেই প্রকাশ করতে পারছি না।

হিমুর সাক্ষাৎকারটি পত্রস্থ করা হলো। তার কোনো ছবি দেওয়া গেল না। আমাদের নিজস্ব ফটোগ্রাফার সৈয়দ সদরুল তাকে নিয়ে ফটোসেশন করিয়েছিলেন। অজ্ঞাত কারণে একটি ছবিও প্রিন্ট হয়নি। আমরা পাঠকদের আশ্বস্ত করছি, অতি শিগগিরই হিমুকে নিয়ে আরেকটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। সেখানে তিনি পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। শ্রেষ্ঠ প্রশ্নকর্তা পাবেন এক হাজার টাকার প্রাইজবণ্ড। এর সঙ্গে তিনি পাবেন আমাদের পত্রিকার ছয় মাসের ফ্রি গ্রাহক সুবিধা। একজন প্রশ্নকর্তা একটির বেশি প্রশ্ন করতে পারবেন না। সেই প্রশ্ন হতে হবে শালীন। প্রশ্ন পাঠানোর শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০০৭। প্রশ্নকর্তা অবশ্যই তার পূর্ণ ঠিকানা পাঠাবেন। ঠিকানাবিহীন প্রশ্ন গণ্য করা হবে না।

প্রতিবেদকের ভাষ্য

হিমুর সন্ধানে ঢাকা শহরের অলিগলিতে এক সপ্তাহব্যাপী অনুসন্ধান চালানো হয়। যে মেসে হিমু থাকেন বলে আমাদের কাছে তথ্য ছিল, সেখানেও কয়েক দফা অনুসন্ধান চালানো হয়। মেসের পরিচালক জনাব আজিজুর রহমান জানান, হিমু কখন আসে কখন যান তা কেউ বলতে পারেন না। হিমুর পরিচিত জন, যেমন মাজেদা খালা এবং মিস রূপার সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। মিস রূপা টেলিফোনে জানান, গত তিন বছরে হিমুর সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। টেলিফোনে মিস রূপা অসহযোগিতামূলক আচরণ করেন

এবং এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে আমাকে 'ইউ স্টুপিড' বলেও গালাগাল করেন।

মাজেদা খালা যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলেন। আমাকে এবং আমাদের ফটোজার্নালিস্ট সৈয়দ সদরুলকে চা এবং নিজের হাতে বানানো ডিমের হালুয়া দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তার সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয় তা সংক্ষেপে আপনাদের জানানো হচ্ছে :

প্রশ্ন : মাজেদা খালা, কেমন আছেন ?

মাজেদা খালা : বাবা, ভালো আছি।

প্রশ্ন : আমরা হিমু বিষয়ে আপনার কাছে জানতে এসেছি।

মাজেদা খালা : বলো, কী জানতে চাও ?

প্রশ্ন : তার পছন্দের খাবার কী ?

মাজেদা খালা : যা দিই তাই তো খায়। আলাদা কোনো পছন্দের খাবার আছে কি-না জানি না।

প্রশ্ন : নাটক-সিনেমা এইসব নিয়ে তার কোনো আগ্রহ আছে ?

মাজেদা খালা : অবশ্যই আছে। একবার দুপুরে আমার বাসায় এসেছে আমার সঙ্গে পুরো একটা বাংলা ছবি দেখেছে।

প্রশ্ন : ছবির নাম বলতে পারবেন ?

মাজেদা খালা : অবশ্যই বলতে পারব। ছবির নাম 'বাবা কেন ড্রাইভার ?' সোশ্যাল অ্যাকশন ছবি।

প্রশ্ন : হিমুর বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভাবছেন ?

মাজেদা খালা : অবশ্যই ভাবছি। আমি ছাড়া হিমুর আর কে আছে! তাকে জোর করেই বিয়ে দিতে হবে। একটা মেয়েকে মনে মনে পছন্দ করে রেখেছি, তার নাম কনা।

প্রশ্ন : হিমু কি মিস কনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন ?

মাজেদা খালা : এই বিষয়ে তার সঙ্গে কোনো কথাই হয়নি। দেখা যাক কী করে! বাবা, তোমরা যদি তার দেখা পাও

তাহলে যেভাবেই হোক আমার এখানে নিয়ে আসবে। তোমাদের দোহাই লাগে।

মাজেদা খালার কাছ থেকে মিস কনার ঠিকানা নিয়ে আমরা তার কলাবাগানের বাসায় উপস্থিত হই।

মিস কনা এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে বর্তমানে ইন্টারে পড়ছেন। আমরা যখন তার বাসায় উপস্থিত হই, তখন তিনি কদবেলের ভর্তা খাচ্ছিলেন। তার পরনে ছিল ফিরোজা রঙের একটা কামিজ। মিস কনার উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। ওজন ৫৮ কেজি। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলা। তিনি ধনু রাশির জাতিকা। তার পছন্দের রং সবুজ। পছন্দের খাবার শুঁটকি। চলচ্চিত্র জগতে তার পছন্দের নায়ক রিয়াজ। নায়িকা পূর্ণিমা। নাট্যজগতে তার প্রিয় অভিনেতা মাহফুজ, অভিনেত্রী শমী কায়সার। তিনি লাক্স-চ্যানেল আই সুপার স্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। থার্ড রাউণ্ডে দর্শকদের এসএমএসে বাদ পড়ে যান। তার প্রিয় কবি শেক্সপিয়ার। প্রিয় ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন। হিমুর সঙ্গে তার বিবাহ বিষয়ে যে কথাবার্তা হয় তা পত্রস্থ করা হলো :

প্রশ্ন : হিমুর সঙ্গে আপনার বিয়ের বিষয়ে যে কথাবার্তা হচ্ছে তা কি জানেন ?

কনা : কেন জানব না ? মাজেদা খালা আমার বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন।

প্রশ্ন : বিয়েতে আপনার মত আছে ?

কনা : পাগল হয়েছেন ? হিমুকে বিয়ে করে সারারাত আমি খালি পায়ে পথে পথে হাঁটব ? আমি থাকব কোথায় ? মেসে ? সে আমাকে খাওয়াবে কী ? সে এর-ওর বাড়িতে খেয়ে আসে। আমিও কি তাই করব ? আমি ফকিরনি না।

প্রশ্ন : কী ধরনের স্বামী আপনার পছন্দ ? অর্থাৎ আপনার স্বপ্নের পুরুষ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

কনা : সে হবে একজন হৃদয়বান আদর্শ সৎ মানুষ। তার সেন্স অব হিউমার থাকবে। বুদ্ধি থাকবে। আমাকে সে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসবে। আমার ইচ্ছাই হবে তার ইচ্ছা। আমি ফাস্টফুড খেতে পছন্দ করি, সেও আমার

সঙ্গে ফাস্টফুড খাবে। তাকে বেড়াতে পছন্দ করতে হবে। প্রতি বছর আমাকে নিয়ে একবার সে দেশের বাইরে যাবে।

প্রশ্ন : আপনার স্বপ্নের পুরুষ সম্পর্কে যেসব গুণের কথা আপনি বলেছেন তার কোন কোনটি হিমুর মধ্যে আছে ?

কনা : ওই পাগলা হিমুর বিষয়ে দয়া করে কোনো প্রশ্ন করবেন না।

আমরা মিস কনার কিছু ছবি তুলতে চাইলাম। তিনি মাথায় জবজব করে তেল দিয়েছেন বলে ছবি তুলতে রাজি হলেন না। আমাদের অন্য আরেকদিন টেলিফোন করে আসতে বললেন। পত্রিকার পাঠকের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে বললাম। তিনি বললেন— 'সৎ হও। এদেশে সৎ মানুষের বড়ই অভাব'।

পাঠকদের নিশ্চয়ই হিমুভক্ত বাদলের কথা মনে আছে। আমরা বাদল সাহেবের ইন্টারভিউ নিতে তার ধানমণ্ডির বাসায় উপস্থিত হলাম। আমাদের বসার ঘরে বসানো হলো। দীর্ঘ সময় (প্রায় ৫০ মিনিট) বসে থাকার পর বাদলের বাবা (হিমুর খালু সাহেব) উপস্থিত হলেন। আমরা কী উদ্দেশ্যে এসেছি শুনেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি বললেন, এই বাড়িতে হিমুর নাম উচ্চারণও নিষিদ্ধ, এটা কি তোমরা জানো না ? এ মুহূর্তে তোমরা যদি বাসা থেকে বের না হও, তাহলে তোমাদের কুত্তা দিয়ে কামড় খাওয়াব।

রাগী এই ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরের গর্জন শোনা গেল। বাদলের বাড়িতে কুকুর থাকে এমন কোনো তথ্য আমরা হিমুর কোনো বইয়ের পাইনি। আমরা পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেট দিয়ে বেরুচ্ছি— বাদলের বাবার রাগ তখনো কমেনি। তিনি উঁচু গলায় হম্বিতম্বি করছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি দারোয়ানকে বললেন, এই দুই গাধাকে কাপড়-চোপড় খুলে নেংটা করে রাস্তায় ছেড়ে দাও। শিক্ষিত ভদ্র সমাজের একজন প্রতিনিধি এমন ভাষা ব্যবহার করবেন আমরা তা কখনোই কল্পনা করিনি। এ জন্যই হয়তো দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমান বলেছেন— 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'।

যা হোক আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল কোতোয়ালি থানার ওসি জনাব কামরুল সাহেবের কাছে। পাঠক মাত্রই জানেন, হিমু অনেকবার এই থানা

হাজতে রাত কাটিয়েছে। ওসি কামরুল সাহেব সুদর্শন মানুষ। গাত্রবর্ণ গৌর এবং হাস্যমুখী। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করলেন। আমাদের চা-শিঙ্গাড়া এবং বিস্কিট খাওয়ালেন। ওসি সাহেবের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হলো :

প্রশ্ন : ওসি সাহেব স্লামালিকুম। ভালো আছেন?

ওসি : পুলিশের চাকরি করে ভালো থাকা কি সম্ভব?

প্রশ্ন : হিমু অনেকবার থানা হাজতে রাত কাটিয়েছেন, এটা কি সত্য?

ওসি : অনেকবার না, দু'তিনবার হতে পারে। থানার রেকর্ড না দেখে বলতে পারব না।

প্রশ্ন : হিমুকে প্রচুর মারধর করা হয়েছে, এটা কি সত্য?

ওসি : পুলিশ সম্পর্কে আপনাদের একটা ভুল ধারণা আছে। আপনারা ধরেই নেন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া মানেই শারীরিক নির্যাতন। পুলিশ জনগণের সেবক।

প্রশ্ন : হিমুকে কখনোই শারীরিক নির্যাতন করা হয়নি?

ওসি : অবশ্যই না। তদন্তের স্বার্থে আমরা জেরা করি, এর বেশি কিছু নয়।

প্রশ্ন : ডিবি পুলিশের পানির ট্যাংকিতে একবার একটা ডেডবডি পাওয়া গেল— এই বিষয়ে কিছু বলবেন?

ওসি : কেন বলব না? ওই লোকটা পানির ট্যাংকি পরিষ্কার করতে গিয়ে পা পিছলে ট্যাংকির ভেতর পড়ে যায়। এই ছিল ঘটনা। বাকিটা পত্রিকাওয়ালাদের বাড়াবাড়ি।

প্রশ্ন : হিমু সম্পর্কে কিছু কি বলবেন?

ওসি : এখন বলতে পারব না ভাই। কিছু মনে করবেন না। জরুরি কাজে যেতে হবে। সরি।

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত বইমেলায় জনৈক বিশালদেহী যুবক এবং একজন লাক্স সুন্দরী হিমু এবং হিমুর স্ত্রী সেজে অনেক ক্যারিকেচার করেছিল। মেলার ভাবগাম্ভীর্য এবং পরিবেশ নষ্ট করেছিল। আমরা এই দু'জনের ইন্টারভিউ নেওয়ার চেষ্টা করি। লাক্স সুন্দরীকে পাওয়া যায়নি। তিনি চ্যানেল আইয়ের শুটিংয়ে ব্যাংকক ছিলেন (নাটকের নাম 'যদি মন কাঁদে' নায়ক ফেরদৌস)। বিশালদেহী যুবককের দেখা পাই। তিনি 'উন্মাদ'

অফিসে বসে পরাটা, গরুর মাংস খাচ্ছিলেন। 'উন্মাদ' পত্রিকার সম্পাদক কার্টুনিস্ট আহসান হাবিবও তখন উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাকে দু' একটা প্রশ্ন করি। কারণ হিমুর লেখক আহসান হাবীবের বড় ভাই।

প্রশ্ন : আপনি কি হিমুর স্রষ্টা বিষয়ে দু-একটা কথা বলবেন ?

উত্তর : উনার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিষয়ে আর কিছু বলব না।

প্রশ্ন : পাঠকরা শুনতে চায় একটা কিছু বলুন।

উত্তর : আমার বড় ভাইয়ের হাতে একটা দামি ক্যামেরা আছে। এই ক্যামেরায় তিনি শুধু জন্মদিনের ছবি তোলেন এবং জানেন না যে, তার ক্যামেরায় ফিল্ম নেই।

প্রশ্ন : এটা কি আপনার কথা ?

আহসান হাবীব : জি না, আমার মেজো ভাইয়ের কথা। উনি আবার অনেক জ্ঞানী।

আমরা বিশাল বপু যুবকের সঙ্গে কথা বললাম। তার খাওয়া তখনো শেষ হয়নি। তিনি দ্বিতীয় দফায় গোশত-পরাটা আনিয়েছেন।

প্রশ্ন : ভাই কী করছেন ?

উত্তর : দেখতেই তো পাচ্ছেন, গোশত-পরাটা খাচ্ছি। অকারণে প্রশ্ন করেন কেন ?

প্রশ্ন : হিমু কি আপনার মতো মোটা ?

উত্তর : হিমু আণ্ডার ওয়েট, তার ওজন ৫০ কেজির নিচে, এমন কথা কি কোনো বইয়ে লেখা আছে ?

প্রশ্ন : ভাই রেগে যাচ্ছেন কেন ?

উত্তর : খাওয়ার সময় বিরক্ত করছেন, এ জন্য রেগে যাচ্ছি। খাওয়ার সময় কোনো ইন্টারাপশান আমি পছন্দ করি না।

প্রশ্ন : বইমেলায় হিমু সেজে আপনি গেলেন, কেন গেলেন হিমুর প্রতি মমতাবশত ?

উত্তর : আমি একজন কবি। কবিতা লিখি। একটা কবিতার বই বের করা দরকার। প্রকাশক পাচ্ছি

Doridro.com

না। হিমু সেজে হৈচৈ করার জন্য প্রকাশক সাহেব খুশি হয়ে আমার কবিতার বই ছাপবেন, এই আশায় ফালতু কাজটা করেছি।

প্রশ্ন : বই কি উনি ছেপেছেন ?

উত্তর : জি না। এখন উনি আমাকে চিনতেই পারেন না।

প্রশ্ন : আপনার কবিতার বইয়ের নামটা জানতে পারি ?

উত্তর : পারেন— 'একটা কালা বিড়াল আমার সিম কার্ডটা দুধে ভিজিয়ে খেয়ে ফেলেছে'।

প্রশ্ন : নাম তো খুব আধুনিক।

উত্তর : আমি আধুনিক কবি, আমার কবিতার নাম কি ঐতিহাসিক হবে ?

প্রশ্ন : ভাই, আপনি কোন রাশির জাতক ?

উত্তর : আমি মোটা রাশির জাতক।

প্রিয় পাঠক! আধুনিক কবি সাহেব আমার সঙ্গে তামাশা করলেন। তিনি বললেন, আমি মোটা রাশির জাতক। অনুসন্ধানে জেনেছি তিনি মেষ রাশির জাতক। এই দেশে সৎ সাংবাদিকতা করা কত কঠিন তা কি বুঝতে পারছেন ? আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এ কারণেই বলেছেন, 'কাণ্ডারি হুঁশিয়ার'।

আমরা হিমু গ্রন্থের লেখকের বাড়িতে এক সকালে উপস্থিত হলাম। লেখক সাহেব খালি পায়ে লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমরা তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে বড়ই আহত হয়েছি। আপনাদের কাছে পুরো কথোপকথন তুলে দিচ্ছি— বিচারের ভার আপনাদের।

প্রশ্ন : স্যার, ভালো আছেন ?

লেখক : কী বলতে এসেছ, বলে বিদায় হও। ভালো আছি না মন্দ আছি দিয়ে কী করবে ? তুমি ডাক্তার না। তোমার সঙ্গী কম্পাউণ্ডার না।

প্রশ্ন : হিমু হলুদ পাঞ্জাবি পরে কেন ?

লেখক : হিমু খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করে বলে প্রায়ই বিষ্ঠায় পা দেয়। বিষ্ঠার রং হলুদ। হিমু বিষ্ঠা পছন্দ করে বলেই হলুদ তার প্রিয় রং। বিষ্ঠা কি জানো তো ? বিষ্ঠা হলো 'গু'।

এই ধরনের উত্তরের পর আর কিছু বলার থাকে না। তারপরেও আমি অতি ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলাম— স্যার, আপনার তিন মেয়ের মধ্যে বড়টির বিবাহ হয়ে গেছে বলে শুনেছি। যে দু'জন বাড়ি আছে তাদের কারো সঙ্গে কি আপনি হিমুর বিবাহ দিতে রাজি আছেন ? আপনি হিমুর শ্বশুর ভাবতেই ভালো লাগছে।

লেখক খানিকক্ষণ কটমট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, গাধা মানুষকে কী বলে তুমি জানো ?

আমি বললাম, জানি না স্যার।

লেখক বললেন, গাধা মানুষকে বলে গা-মানুষ। তুমি একজন গা-মানুষ। আমি নিজেও একজন গা-মানুষ। গা-মানুষ না হলে কেউ হিমুকে নিয়ে এতগুলো বই লেখে না। এত যন্ত্রণা মাথায় নেয় না। এখন বিদায় হও।

এই পর্যায়ে লেখকের স্ত্রী (দ্বিতীয় স্ত্রী) শাওন ম্যাডাম আমাদের অন্য ঘরে নিয়ে চা-নাশতা খেতে দেন এবং বলেন, লেখকের কথায় কিছু মনে করবেন না। সকালবেলায় তার মেজাজ খারাপ থাকে। শাওন ম্যাডামকে চিনেছেন তো ? তাকে নিয়ে আমি একটি সচিত্র প্রতিবেদন ছাপিয়েছিলাম। শিরোনাম 'কালনাগিনীর প্রেমকথা'। আশা করি আপনাদের চোখে পড়েছে, যদিও অনেক দিন আগের কথা।

অত্যন্ত বিষণ্ন হৃদয়ে আমরা লেখকের বাসস্থান ত্যাগ করি এবং 'অন্যরাত' প্রকাশনার কর্ণধার জনাব আজহারুল ইসলাম সাহেবের অফিসে উপস্থিত হই। তিনি সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে দুঃখভারাক্রান্ত হন। তিনি লেখকের উগ্র মেজাজের কঠিন সমালোচনা করেন। তার বক্তব্য ছিল বাস্তব এবং যুক্তিসম্মত। তিনি বলেন, হিমুবিষয়ক বই আমাদের চালু আইটেম। হিমুকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য। লেখককে আমরা অনেক অনুরোধ করেছি যেন অন্তত বর্ষাকালে হিমু রাবারের জুতা পরতে পারে এই ব্যবস্থা করা হয়। বর্ষাকালে নগরীর নালা নর্দমার দূষিত পানির ওপর খালি পায়ে কেউ হাঁটে না। একবার পা কেটে গেলে গ্যাংগ্রিন ফ্যাংগ্রিন কত কিছু হতে পারে। তখন পা কেটে ফেললে কী অবস্থা হবে লেখক স্যার কি বুঝতে পারছেন ? ল্যাংড়া হিমুর বই কেউ পড়বে ?

পৌষ-মাঘ মাসের শীতে হিমু বেচারাকে একটা পাঞ্জাবি পরে ঘুরতে হয়। ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া বাধালে উপায় আছে ? লেখক স্যারকে আমরা

কত বুঝিয়েছি পৌষ-মাঘ মাসের শীতে তিনি যেন হিমুর জন্য চাদর বা কোটের ব্যবস্থা করেন। তিনি তাতেও রাজি না।

আমি আজহারুল ইসলাম সাহেবের প্রতিটি কথায় একমত হয়েছি। উনার সঙ্গে আলাপচারিতায় জানতে পেরেছি, লেখক স্যার হিমুকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কীভাবে মারবেন ঠিক করতে পারছেন না বলে এখনো মারেন নি। তার মাথায় যে কোনো সময় আইডিয়া চলে আসবে— হিমুর জীবনাবসান হবে। কী ভয়ঙ্কর কথা!

প্রিয় পাঠক! স্থানাভাবে হিমুর একান্ত সাক্ষাৎকার এবার দিতে পারছি না। আগামী যে কোনো বিশেষ সংখ্যায় সাক্ষাৎকার পত্রস্থ করা হবে। পাঠক সমাজের অবগতির জন্য জানাচ্ছি— আপনারা হিমু সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন। যেমন তার রাজনৈতিক মতাদর্শ (বিএনপি না আওয়ামী লীগ)। রূপচর্চা বিষয়েও তিনি আমাদের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। অতিরিক্ত রোদে ঘোরাঘুরি করে চামড়ার যে ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিপূরণে কী করা উচিত ইত্যাদি।

হিমু-রূপার প্রণয় বিষয়েও তিনি মুখ খুলেছেন। যদিও তিনি বলেছেন, এই বিষয়টা অফ দ্য রেকর্ড, তারপরেও কিছু কাটছাঁট না করে আমরা আপনাদের জানাব। পাঠকের কৌতূহল মেটানো আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।

❒